নবজাগরণের অগ্রদূত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
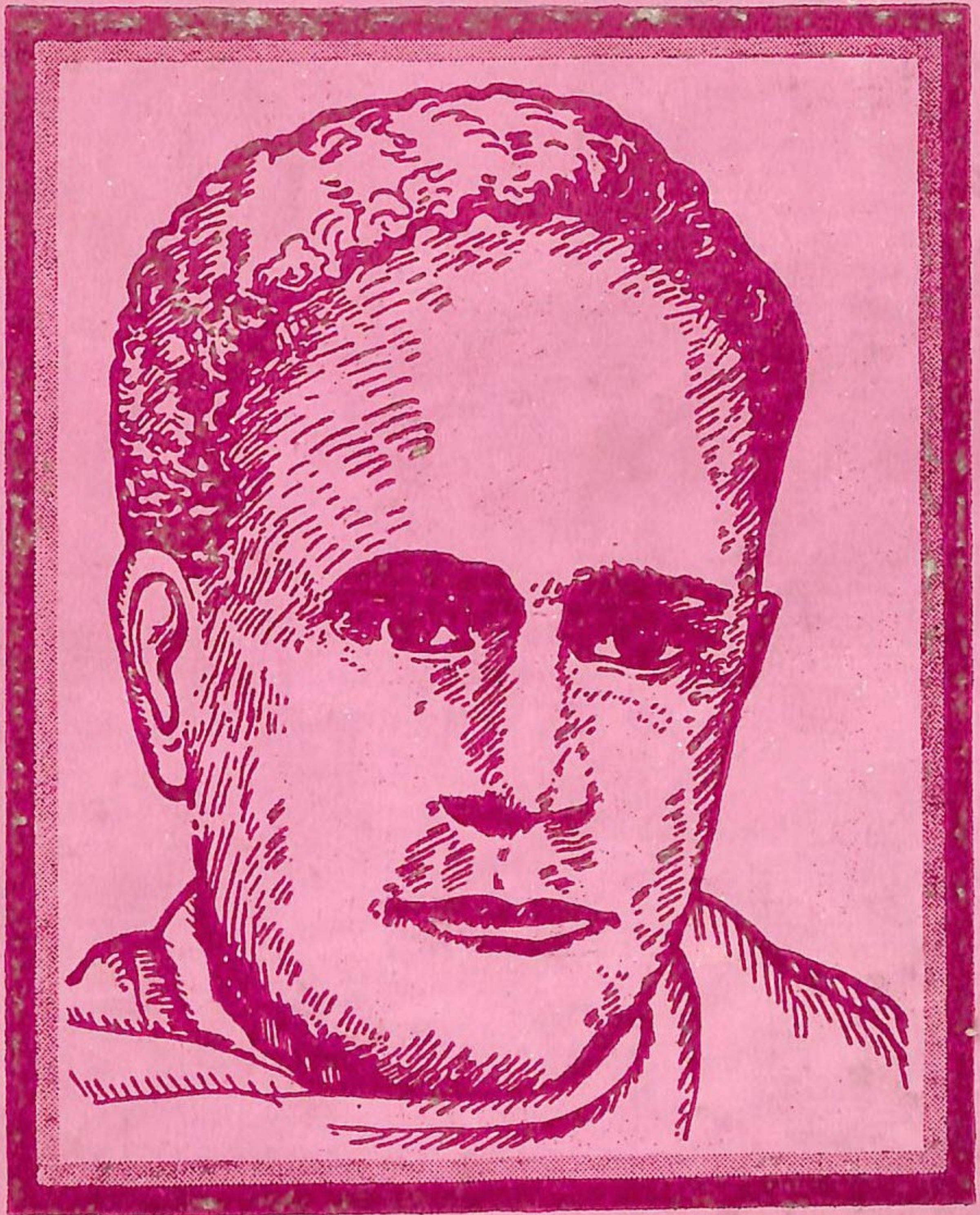
পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ, ১৩৯৬
বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার থেকে শ্রীগৌরীশঙ্কর রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
শ্রীইন্দ্র দুগার অঙ্কিত,
(শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারীর বিদ্যাসাগর গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

মূল্য ঃ ১২\ টাকা

ভবানীপুর আর্ট প্রেস, ৮০ আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫
কর্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গত জননী
শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীচরণের উদ্দেশে—

প্রকাশকের নিবেদন

সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। প্রতি বছর প্রধানতঃ বইমেলায় আমরা ভারতীয় নবজাগৃতির প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণামূলক বই সুধীজনের হাতে তুলে দিয়েছি। পুস্তক প্রেমী ক্রেতাদের মধ্যে অনেককেই তখন বলতে শুনি, আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ার মত বিদ্যাসাগর-জীবনী তেমন দেখতে পাই না, আপনারা যদি এই ধরণের বই প্রকাশ করেন তো বড় ভাল হয়। সকলের আগ্রহের কথা মনে রেখে তাই আমরা আমাদের সাধারণ সম্পাদক, প্রাণচঞ্চল তরুণ কর্মী, বিদ্যাসাগরে নিবেদিত প্রাণ শ্রীপার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাই এরূপ একটি বই লেখার জন্য। তিনি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধাররূপে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ছোটদের জন্য এই জীবনী পুস্তকটি লিখে দিয়েছেন।

আমরা আশাকরি ছোটদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি যথাযথ ধারণা গড়ে তোলার মত সুন্দর চিত্র তিনি আঁকতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর তথ্যনিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল লেখার মাধ্যমে। এই বইটি ছোটদের ভাল লাগলে এবং তাদের জীবনকে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করতে পারলে আমাদের প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

গৌরীশংকর রায়

মুখবন্ধ

"সাগরে যে অগ্নি থাকে
কল্পনা সে নয়
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর
হয়েছে প্রত্যয়।"

—*সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত*

কবির কল্পনায় যা ধরা পড়ে না, তা বাস্তব হ'য়ে ধরা দিয়েছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামের এক অসাধারণ মানুষের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিত্ব সমন্বিত পৌরুষ মানুষের কাছে দুর্লভ বস্তু। যাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেখে পণ্ডিত সমাজ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছিল, যাঁর করুণাবান হৃদয়ের সীমাহীন বিস্তার দেখে সাধারণ মানুষ দয়ার সাগর নামে অভিহিত করেছিল, তাঁর "অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব" বিস্মিত করেছে যুগান্তরের কবিকেও।

শুধুই কি বিদ্যা ও করুণা, বুদ্ধির প্রজ্ঞা ও অমেয় বেদনাবোধ, শুধুই কি পৌরুষের চোখ ঝলসানো দীপ্তি? বিদ্যাসাগর ছিলেন জাতির জনক; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক, ভারতের নব্যশিক্ষা রীতির জনক, অন্ধতা ও সংস্কার মুক্তির জনক, নারীর মুক্তি সংগ্রামের জনক, ভারতের নতুন চেতনার জনক। প্রথম বর্ণপরিচয়ের মুহূর্তেই তাঁর ছবি আঁকা হ'য়ে যায় শিশুদের বুকে।

তাঁকে ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ?

দেশের এক নগন্য গ্রামের, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জাত যে মানুষ, তার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি এবং দানের অজস্রতায় উজ্জ্বল হ'য়ে আছেন ইতিহাসে, তাঁর জীবন ও চিন্তাদর্শণের সঙ্গে পরিচয় ঘটা চাই দেশের প্রত্যেকটি বালক বালিকার। অচিন্ত্যনীয় সেই ইতিহাস-পুরুষকে ছোটদের মতো করে পৌঁছিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছেন শ্রীমান পার্থ-সারথি চট্টোপাধ্যায়, তার জন্য নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কামনা করি, পার্থসারথির 'নবজাগরণের অগ্রদূত বিদ্যাসাগর' বাংলার কিশোর মনে আদর্শ বাদের চেতনা নিয়ে আসবে।

সন্তোষ কুমার অধিকারী

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরি পরিমাণ বাক্যরচনা করতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি, পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—রমেশচন্দ্র দত্ত

"বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি নিজে। অবিনশ্বর অজেয়, দুর্দমনীয় পৌরুষসম্পন্ন একটি মূর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যতের জন্য। এ' মূর্তি না দেখিলে জানিতে পারিতাম না যে, বাংলা দেশের নরম মাটি শিল্পীর হাতের গুণে এমন বজ্র শিলায় পরিণত হইতে পারে। জানিতে পারিতাম না যে, একালের সাড়ে তিন হাত মানুষ মহাভারতীয় চরিত্রের অতিকায়িকতা লাভ করিতে পারে।

—প্রমথ নাথ বিশী

ভূমিকা

যুগস্রষ্টা মহামানবদের মধ্যেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত এমন সর্বব্যাপী প্রতিভা ও কর্মধারা-বিশিষ্ট কালজয়ী, উজ্জ্বল জীবন একান্ত বিরল।

বিদ্যাসাগর যেমন তাঁর দরিদ্র পিতার মতই একদিন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তেমনি আবার স্বোপার্জিত বিপুল অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন আর্ত মানুষের সেবায়, বিধবা বিবাহে ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিক্ষার আলোকে পৌঁছে দেবার জন্য।

তাঁর বিদ্যা। তাঁর দয়া। তাঁর পৌরুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম। আত্মমর্যাদাবোধ, জাতীয় চেতনা ও মানবপ্রেম সত্যই আদর্শ স্থানীয়।

বিদ্যাসাগরের প্রদীপ্ত জীবনকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে তুলে ধরার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যদি এর মধ্য থেকে তা'রা তা'দের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়

গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন। রামমোহন রায়ের পর ওখানে একের পর এক মহাপুরুষের আগমন হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই জন্মেছেন। একথা বলা যেতে পারে যে, যদি ঈশ্বরচন্দ্র কোন ইউরোপীয় দেশে জন্মাতেন, তবে ইংলণ্ডে নেলসনের যেমন স্মারক বানানো হয়েছে, সেইরূপ স্মারক ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরও স্থাপিত হত।

—মহাত্মা গান্ধী

'বিদ্যাসাগর' এই বাক্যটি আমার নিকট একটি নাম মাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।

—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বনমালীপুর গ্রামে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাম রামজয় তর্কভূষণ। অতি দরিদ্র তাঁদের অবস্থা। ভাল করে অন্নসংস্থান করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্ত্রী দুর্গা দেবী, পুত্র ঠাকুরদাস ও আরও পাঁচটি সন্তান নিয়ে ভায়েদের সঙ্গে একসঙ্গেই থাকা রামজয়ের। কিন্তু আয় কম তাই ভায়েরা ভাল ব্যবহার করে না। রোজই খাওয়ার খোঁটা দেয়। আর সহ্য করতে পারে না রামজয়; হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন ব্রাহ্মণ। এদিকে সন্তানদের নিয়ে দুর্গাদেবী পড়লেন চরম বিপদে। কিছুদিন শ্বশুর-বাড়ীতেই পড়ে রইলেন। কিন্তু বেশীদিন গঞ্জনা সহ্য করতে পারলেন না, চলে এলেন পিতা উমাপতি তর্কালঙ্কারের কাছে বীরসিংহ গ্রামে।

পিতৃগৃহে মোটামুটি দিন চলতে লাগল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হল পিতা বৃদ্ধ হতে। উমাপতির বড় ছেলেই তখন কার্য্যতঃ বাড়ীর কর্ত্তা ও তার স্ত্রী কর্ত্রী। কাজেই ক্রমে ক্রমে এখানেও ওদের ব্যবহারে দুর্গাদেবীর জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বৃদ্ধ উমাপতি সব দেখেও বুঝেও কিছু করে উঠতে পারলেন না। একদিন দুর্গাদেবী বাবাকে বললেন, বাবা আমাকে একটা চালাঘর তুলে দাও আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওখানেই থাকব। চরকায় সুতো কাটব। কোন মতে একবেলা দুটো শাকভাত জুটলেই চলবে। মনে মনে আঘাত পেলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উমানাথ সেই মতই ব্যবস্থা করলেন। এই ভাবেই নতুন করে দিনশুরু হল দুর্গাদেবীর। কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া ও নিজের জীবন রক্ষা করতে পারা কম কথা নয়। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল দুর্গা-দেবীর জীবন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় ঠাকুরদাসের তখন বয়স চোদ্দ পনের বছর, মায়ের এই চূড়ান্ত দুঃখ কষ্ট আর দেখতে পারে না সে। যে করেই হোক একটা চাকরী যোগাড় করে কিছু আয় করতে

পারলে মায়ের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পারবে এই আশায় মাকে বললেন, মা আমি চাকরী করতে কলকাতা যাব। মা চিন্তিত হলেন। বললেন, অচেনা জায়গায় কি করে যাবি, কে তোকে কাজ দেবে। ঠাকুরদাস বললেন, চিন্তা কোরোনা মা আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। অতএব চিন্তিত দুর্গাদেবী পুত্রকে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

কলকাতায় ঠাকুরদাসদের এক আত্মীয় সভারাম বাচস্পতি বাস করতেন। ঠাকুরদাস গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিয়ে তাঁদের দুঃখ কষ্টের বিবরণ দিলে তিনি চিনতে পারলেন ও বললেন, তাঁর বাসায় থেকে চাকরীর চেষ্টা করতে পারে ঠাকুরদাস। অল্প বয়সে পিতা রামজয় নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় ভাল ভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি ঠাকুরদাস। তাঁর একান্ত ইচ্ছা কলকাতায় চতুষ্পাঠিতে পড়াশোনা করবেন। কিন্তু দুঃখিনী মায়ের মুখটা মনে পড়লে সে ইচ্ছা চাপা পড়ে যায়। মোটামুটি কাজ চালানোর মত ইংরাজী না জানলে চাকরী পাওয়া মুশকিল। কিন্তু কার কাছে ঠাকুরদাস ইংরাজী শিখবেন? যে বাড়ীতে তাঁর আশ্রয় হয়েছে সেই সভারাম বাচস্পতির পুত্র জগমোহন ন্যায়ালঙ্কারের কাছে ঠাকুরদাস তাঁর ইচ্ছার কথা জানালে জগমোহন প্রাথমিকভাবে ঠাকুরদাসকে ইংরাজী পড়াবার জন্য তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাকুরদাস দারুণ আনন্দিত হলেন। শুরু হল তাঁর ইংরাজী শিক্ষা। কিন্তু ভদ্রলোক দিনের বেলায় চাকরী করতেন তাই ঠাকুরদাসকে পড়াতে বেশ রাত হয়ে যেত। পড়া শেষ করে যখন ঠাকুরদাস সভারামের বাড়ী এসে পৌঁছতেন তখন সবার খাওয়া শেষ, কাজেই বেশীর ভাগ দিনেই ঠাকুরদাসকে উপবাসে থাকতে হত।

এইভাবে চলতে চলতে কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরদাসের শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল। ইংরাজী শিক্ষক ভদ্রলোকের চোখেও পড়ল ব্যাপারটা। তিনি একদিন ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করে তাঁর অবস্থার কথা জানতে পারলেন। তখন সেখানে উপস্থিত তাঁর এক আত্মীয় ঠাকুরদাসকে বললেন, বুঝতে পারছি তোমার

ওখানে থেকে ইংরাজী শিক্ষা হবে না। তুমি যদি রেঁধে খেতে পার তাহলে আমি তোমায় আমার বাসায় রাখতে পারি। ঠাকুরদাস এসে উঠলেন তাঁর নতুন আশ্রয়ে। এই ভদ্রলোকের মন যেমন উদার, আয় তেমন ছিল না। কাজেই এখানে এসেও ঠাকুরদাসের দুবেলা ভালভাবে আহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত হল না। ভদ্রলোকের রোজগার দালালি করে। কাজেই হঠাৎ আয় কমে যাওয়ায় দুজনেরই কোনদিন অর্ধাহার কোনদিন অনাহার। ঠাকুরদাসের সম্বলের মধ্যে একখানা পেতলের থালা আর ছোট্ট ঘটি। ভাবলেন এগুলো বেচে দিয়ে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে অন্তত দু একটা দিন তো পেট ভরে খাওয়া যাবে। কিন্তু অচেনা লোকের কাছ থেকে কেউই থালা কিনতে রাজী হল না। সকলেই ফিরিয়ে দিল ঠাকুরদাসকে। একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাকুরদাস। খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছেন না। ভেবেছিলেন হাঁটাহাঁটি করে মনকে অন্যমনস্ক করে খিদের জ্বালা ভুলে থাকবেন। কিন্তু ফল হল উল্টো, আর হাঁটবার ক্ষমতা রইল না তার। বড়বাজার থেকে ঠন্‌ঠনে পর্যন্ত হেঁটেছেন। এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন একটি মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে। একটি বিধবা স্ত্রীলোক দোকানে মুড়ি-মুড়কি বিক্রি করছেন। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ঠাকুরদাস বললেন, যে একটু জল খাবেন। ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেবেন, তাই স্ত্রীলোকটি একটু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস দারুণ ক্ষুধায় যে-ভাবে মুড়কি খেলেন তা দেখে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে, বাবা ঠাকুর তোমার বোধহয় আজ খাওয়া হয়নি। ঠাকুরদাস বললেন, না মা আজ আমি এখনও পর্যন্ত কিছুই খাইনি। স্ত্রীলোকটি জল খেতে বারণ করলেন ঠাকুরদাসকে। তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ী থেকে দই নিয়ে এলেন এবং মুড়কির সঙ্গে দই দিয়ে ভাল করে ফলার খেতে দিলেন ঠাকুর-দাসকে। এরপর ঠাকুরদাসের কাছে সমস্ত ইতিবৃত্ত শুনলেন সেই স্ত্রীলোকটি এবং তাকে বলে দিলেন, যেদিন দরকার হবে সেদিন যেন সে এসে ফলার করে যায়। এই দয়াবতী নারীর কাছে যেতেন ঠাকুর-

দাস প্রয়োজনে মাঝে মাঝে।

নিজের তো একরকম কোনও ভাবে চলে যাচ্ছে কিন্তু গ্রামে মা এবং ভাই বোনদের মুখ যখনই ভেসে ওঠে তখনই মনটা স্থির রাখতে পারেন না ঠাকুরদাস। পাগলের মতন চাকরীর চেষ্টা করতে থাকেন। আশ্রয়দাতা ভদ্রলোককেও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলে তিনি দুটাকা মাহিনার একটি চাকরী যোগাড় করে দিলেন। মাইনের দুটাকাই বাড়ীতে পাঠান মা ভাই বোনেদের জন্য। দাদার চাকরী হয়েছে ভাইবোনেরাও আনন্দে আত্মহারা। মনিবও খুব খুসী ঠাকুরদাসের কাজকর্মে, তাই দুবছর পর মাহিনা বাড়িয়ে পাঁচটাকা করে দিলেন। এখন তবু মা ভাই বোনদের দুঃখকষ্ট কিছুটা লাঘব হল।

এই সময় আরও একটা ভাল ঘটনা ঘটল। রামজয় নিরুদ্দিষ্ট হয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে ভগবৎ সাধনায় দিনযাপন করছিলেন। হঠাৎ কেদার পাহাড়ে ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নাদেশ শুনলেন, রামজয় তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তোমার পরিবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি পাণ্ডিত্যে এবং দয়ায় সমগ্র দেশের মধ্যে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। তীর্থে থাকতে থাকতে তাঁর সংসারের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলেন রামজয়, তাই হঠাৎ এই স্বপ্নে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তিনি। ভেবে চিন্তে দেশে ফেরাই সাব্যস্ত করলেন। বনমালীপুরে এসে জানতে পারলেন যে, দুর্গাদেবী পুত্রকন্যাদের নিয়ে বীরসিংহে বসবাস করছেন। প্রায় আট বছর পর রামজয় আবার ফিরে এলেন, এসে পৌঁছলেন বীরসিংহে। সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে দুর্গাদেবীর বুক আনন্দে ভরে উঠল।

কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে রামজয় কলকাতায় এলেন বড়ছেলে ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা করতে। বড়বাজারে ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল রামজয়ের। রামজয়ের সমস্ত ইতিহাস শুনলেন তিনি, শুনে বললেন, আপনার ছেলেকে আমার কাছে রেখে যান। সেই থেকেই ঠাকুরদাস ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ীতেই বাস করতে

লাগলেন। শ্বশুরালয়ের নিকটে থাকা রামজয় সম্মানজনক মনে করলেন না তাই বনমালীপুরে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর মুখে ভায়েদের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে বীরসিংহেই স্থায়ীভাবে থাকা স্থির করলেন। এবার ছেলের বিয়ে দিতে চান রামজয়।

বিয়ের জন্য খোঁজ খবর করতে লাগলেন রামজয়। অবশেষে খোঁজ পেলেন গোঘাটের রমাকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের কন্যা ভগবতীর। ওইখানেই বিয়ের ঠিক হল। ভগবতীর মামার বাড়ী পাতুলে, মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ।

এর পর ভগবতীদেবী সন্তানসম্ভবা হলেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল ভগবতীদেবীর প্রায় উন্মাদ দশা উপস্থিত হওয়ায়। দুর্গাদেবী অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বধূর রোগ উপশম হল না। কেউ কেউ বললেন ডাইনিতে পেয়েছে। কেউ রোজা ডেকে চিকিৎসার কথা বললেন। অবশেষে উদয়গঞ্জ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখান হয়। ইনি দৈবজ্ঞ জ্যোতিষী, রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠী গণনাও করতেন। রোগিনীকে দেখার পর তিনি দুর্গাদেবীর কাছে রোগিনীর কোষ্ঠী দেখতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানন্দ শিরোমণি বললেন, "ইহার কোন রোগ নাই, ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রবাহে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করাইবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগ মুক্ত হইবেন।" ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য যা বলেছিলেন তাই হল। বাংলা ১২ই আশ্বিন ১২২৭ সন, ইংরেজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সাল মঙ্গলবার দুপুরবেলা হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী সন্তান প্রসব করলেন। পিতা ঠাকুরদাস তখন বাড়ী ছিলেন না। মঙ্গলবারের হাটে গেছেন কোমরগঞ্জ। সুখবরটা তাকে দিতে রামজয় কোমরগঞ্জের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পথে দেখা পিতাপুত্রে। রামজয় ঠাকুরদাসকে বললেন, আমাদের বাড়ীতে একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাড়ীর গোয়াল ঘরে একটি গরুরও বাছুর হবার কথা ছিল। ঠাকুরদাস বাড়ী পৌঁছে তাই গোয়ালঘরে উঁকি মারলে

রামজয় বললেন ওদিকে নয় এদিকে এসো এঁড়েবাছুর দেখাচ্ছি। এই কথা বলে আঁতুড় ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন রামজয় ও নবজাতককে দেখালেন ঠাকুরদাসকে। এরপর রামজয় এই দেবশিশুকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলে ক্ষণজন্মা, এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা ও দৃঢ়চিত্ত হবে। যা মনে করবে তাই করবে। এর জন্য বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বংশ ধন্য হবে। এর নাম রাখলাম ঈশ্বর। আঁতুড় ঘরে রামজয় নবজাতকের জিভের নীচে যেন কি লিখে দিলেন। দুর্গাদেবীকে বললেন —তোমার নাতি কিছুক্ষণের জন্য মায়ের দুধ খেতে পারবে না। এর জন্য চিন্তা কোরো না। কোমল জিভে আমার কঠিন আঙুল দেওয়ায় কিছুদিন তোতলা হয়ে থাকবে। তবে এ অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হবে।

ঈশ্বর জন্মানোর পর সত্যসত্যই ভগবতীর উন্মাদ রোগ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। আর পিতামহ রামজয়ের ভবিষ্যৎবাণী তো সমগ্র জাতি বাস্তব অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে নিয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বছর হল তখন ঠাকুরদাস তাকে ভর্তি করে দিলেন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। লেখাপড়ায় দারুণ আগ্রহ ঈশ্বরের। চমৎকার হাতের লেখা। কিন্তু দুষ্টুমিতেও কম যায় না সে। তার দুষ্টুমির জন্য প্রতিবেশিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদিন ধানক্ষেতের আল দিয়ে পাঠশালা থেকে আসবার সময় একমুঠো ধানের শিষ মুখে পুরে দিলেন ঈশ্বর। আর কয়েকটা শিষ গলায় বিঁধে গেল। প্রায় যায় যায় অবস্থা। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এলো। ঠাকুরমা দুর্গাদেবী অনেক চেষ্টা করে গলায় আঙুল দিয়ে শিষগুলো বার করে ফেললেন। সে যাত্রা ঈশ্বর বেঁচে গেল।

পাঠশালায় ঈশ্বর সবচেয়ে ভাল ছাত্র, অসম্ভব মেধা ঈশ্বরের। কালীকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ছেলে বড় হয়ে মস্ত বড় বিদ্বান পুরুষ হবে, তাই সব সময় নজর রাখতেন ঈশ্বরের ওপর। এমন কি পাছে আবার কি করে বসে তাই সঙ্গে করে পৌঁছে দিতেন বাড়ী। দেখতে দেখতে পাঠশালায় ঈশ্বরের পাঠ সমাপ্ত

হল। কালীকান্ত ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দিলেন ঈশ্বরকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরাজী পড়ালে ঈশ্বর জীবনে উন্নতি করবে।

ঠাকুরদাস কলকাতায় চাকরী করেন। গ্রামে খুব একটা আসা হয় না। সেবার বাবার অসুখের খবর পেয়ে এলেন বীরসিংহে। ঠাকুরদা আর ঠাকুরমার নয়নের মণি ঈশ্বর শতদুষ্টুমি করলেও ছুটে এসে ওঁদের আশ্রয়ে পৌঁছে গেলে আর কোনও চিন্তা নেই, আর মা শাসন করতে পারবে না। অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে ভগবতীদেবী তাড়া করে এলে রামজয় বলেন, সব মহাপুরুষই ছোটবেলায় একটু দুষ্টু হন তাকি জানো না? আমি বলে রাখলাম বৌমা, তোমার এ ছেলে যদি একজন কীর্তিমান পুরুষ না হয় তবে আমি পৈতে ফেলে দেব।

ঈশ্বরকে কলকাতায় পড়তে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে ভগবতীদেবী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। রামজয় বললেন তাই ভাল ঠাকুরদাস, তুই বরঞ্চ ঈশ্বরকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালভাবে লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর। কিন্তু তখন আর যাওয়া হল না। রামজয়ের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করল। ঠাকুরদাস কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু আবার বীরসিংহে এলেন, রামজয় ইহলোক ত্যাগ করলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। আজন্ম সঙ্গী এক বড় আশ্রয় ঠাকুরদা চলে গেলেন। ঈশ্বর মনে খুব আঘাত পেল, বড় নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল তার।

পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ঠাকুরদাস কলকাতা যাওয়ার সময় আট বছরের বালক ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। সঙ্গে চলল ভৃত্য আনন্দরাম ও শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এতটুক ছেলে অত দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে পারবে না, তাই আনন্দরামকে সঙ্গে নেওয়া কাঁধে করে নেওয়ার জন্য। বীরসিংহ থেকে কলকাতা কম দূরতো নয়। শিয়াখালার কাছে সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠে ঈশ্বর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা রাস্তার ওপর বাটনাবাটার শিল পোঁতা আছে কেন? ঠাকুরদাস বললেন ওগুলো শিল নয় ওগুলোকে বলে মাইলষ্টোন। মাইলষ্টোন মানে পথের দুরত্ব লেখা

পাথর, এখানে প্রতি মাইল অর্থাৎ প্রায় আধক্রোশ অন্তর ইংরাজীতে অক্ষর লেখা আছে। মাইলষ্টোনের কাছে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে দেখালেন, দেখ এখানে ইংরাজীতে উনিশ লেখা আছে। ঈশ্বর বুঝে নিল এবং পর পর মাইলষ্টোনগুলিতে ইংরাজী নম্বরগুলো দেখতে দেখতে চলতে লাগল। এইভাবে যেতে যেতে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে প্রায় সবগুলো অক্ষর দেখালেন। তারপর যখন আবার আট নম্বর এল ঈশ্বর বললেন বাবা আমি ইংরাজী অঙ্ক শিখে ফেলেছি। ঠাকুরদাস ভাবলেন পরীক্ষা করে দেখা যাক। তিনি পরপর কয়েকটা অঙ্ক জিজ্ঞাসা করলেন ঈশ্বর ঠিক মত উত্তর দিল। ঠাকুরদাস ভাবলেন যে পরপর অঙ্ক দেখে হয়ত চালাকি করে ঈশ্বর বলছে, আসলে হয়ত ইংরাজী অঙ্ক সে চেনে না। তাই তিনি এবার ছয় লেখাটা ঈশ্বরকে গল্প করতে করতে পার করে দিলেন, ঈশ্বর ছয় অঙ্কটা দেখতে পেল না। এবার যখন পাঁচ অঙ্কটা এল ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন এটা কত অঙ্ক বলতো। ঈশ্বর দেখে বলল বাবা এটা ছয় হবে কিন্তু এরা ভুল করে পাঁচ লিখেছে ঠাকুরদাস বললেন, না বাবা ভুল হয়নি আমি তোমাকে ছয় নম্বরটা দেখাইনি। কালীকান্তের বুকটাও আনন্দে ভরে উঠল, ঈশ্বরকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

যে বাড়ীতে ঠাকুরদাস থাকতেন সেই ভগবতচরণ সিংহের বাড়ীতেই এসে উঠলেন ঠাকুরদাস। ভগবতচরণ গত হয়েছেন এখন বাড়ীর কর্ত্তা ছেলে জগদ্দুর্লভ সিংহ। ঈশ্বর বাবার সঙ্গে এখানেই উঠেছিল। পরদিন ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভের ইংরাজী বিল ঠিক করছিলেন। ঈশ্বর বলল বাবা আমি এগুলি ঠিক করতে পারি। সিংহমশাই বললেন, তা কি করে হয়, তুমি কি ইংরাজী অঙ্ক চেন? ঈশ্বর বলল, কেন, বাবা ও খুড়া মশাই আমাকে রাস্তায় মাইলষ্টোন দেখিয়ে অঙ্ক শিখিয়েছেন। তখন জগদ্দুর্লভ সিংহ কয়েকটি বিল ঈশ্বরকে দিলেন। ঈশ্বর অল্পক্ষণ মধ্যেই বিলগুলি ঠিক করে দিল। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কালীকান্ত ঈশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন আমার অক্লান্ত চেষ্টা সফল হয়েছে, তুমি চিরজীবী হও।

এখন ভাবনা হল ঠাকুরদাসের, ছেলেকে তো বাড়ীর সকলের মতের বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি তার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করতে তো হবে। কিন্তু কোথায় পড়াবেন ? জগদ্দুর্লভ বললেন আমাদের বাড়ীর কাছেই স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালা, ভালই পড়ান। আমার ভাগ্নেরা ওইখানেই পড়ে, মল্লিকবাড়ীর ছেলেরাও পড়ে। এবছরটা ঈশ্বরকে ওখানেই ভর্ত্তি করে দিন। সেই পরামর্শ মত ঠাকুরদাস ছেলেকে স্বরূপ দাসের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিলেন। সেবছর বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র তিনমাস বাকি। কিন্তু হলে কি হবে, ছাত্রটির নাম যে ঈশ্বরচন্দ্র। তিনমাসেই পাঠশালার সব পড়া শেষ করে ফেলল ঈশ্বর। পণ্ডিত মশাই অনেক ছাত্র পড়িয়েছেন, কিন্তু এরকম মেধাবী ছাত্র কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষক তাই ঈশ্বরের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ভবিষৎবাণী করলেন।

পাঠশালার পড়া ত শেষ হল এবার ছেলেকে কোথায় পড়াবেন ঠাকুরদাস ? নিজের অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও ভালভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি ঠাকুরদাস, তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে ছেলে সংস্কৃত পণ্ডিত হয়ে দেশে গিয়ে ছাত্রদের জন্য টোল খুলে বসুক। তখন কলকাতায় দিনে মাছি আর রাতে মশার উপদ্রব ছিল খুব। এই সবেতে ঈশ্বরের শরীর ভাল থাকল না। গ্রামাঞ্চল থেকে এসে কিছু-দিনের মধ্যেই পেটের গোলমালে ভুগতে লাগল ঈশ্বর। পেটের অসুখ থেকে হল রক্তাতিসার। ঠাকুরদাস এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা ও সেবা যত্নের সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু ফলকিছু হল না। এমনকি ঠাকুরদাস পুত্রের মল মূত্র নিজের হাতে পরিস্কার করতে লাগলেন। বাড়ীতে খবর গেল। ঠাকুরমা দুর্গাদেবী নাতির অসুখের খবর শুনে পাগলের মত ছুটে এলেন। কবিরাজী চিকিৎসায় যখন কোনও ফল হল না তখন বললেন, ঠাকুরদাস আমি ঈশ্বরকে বাড়ী নিয়ে যাই। ঠাকুরদাসও বুঝতে পারলেন যে স্থান পরিবর্ত্তন করা দরকার, তাই মত দিলেন। দুর্গাদেবী ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহে ফিরে এলেন। ওষুধপত্রের বিশেষ দরকার হল না গ্রামের জল হাওয়ায় অল্পদিনেই ঈশ্বর

সুস্থ হয়ে উঠল। জ্যৈষ্ঠমাসে ঠাকুরদাস আবার বাড়ী এলেন ঈশ্বরকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুর্গাদেবী আর কলকাতা পাঠাতে নারাজ। ঠাকুরদাস বললেন, কেন কোলকাতায় কি মানুষ থাকে না ? ঠাকুরদাসের জেদের কাছে সবাই নত হলেন। ঠাকুরদাস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন কিরে আনন্দরামকে সঙ্গে নিতে হবে তো ? ঈশ্বরচন্দ্রের বোধহয় আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগল, বলল, না না আমি ঠিক যেতে পারব। সত্যি ভয়ানক অভিমান ঈশ্বরচন্দ্রের, মায়ের মামার বাড়ী পাতুল পর্যন্ত অবলীলাক্রমে হেঁটে চলে এলো। ঠাকুরদাস কাঁধে নিতে চাইলেও সে কাঁধে উঠতে চাইল না। পরদিন কলকাতা যাত্রার পর তিনক্রোশ হেঁটেই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পায়ে বেদনা আরম্ভ হল, ক্রমে পা ফুলে গেল আর সে হাঁটতে পারে না। ঠাকুরদাস লোভ দেখাতে লাগলেন আর একটু গেলেই মিষ্টি তরমুজ পাওয়া যাবে খাওয়াবো। অনেক কষ্টে কোন রকমে আরও কিছুদূর গেল ঈশ্বর। ঠাকুরদাস তরমুজ কিনে খাওয়ালেন। কিন্তু তরমুজ খেতে ভাল লাগলেও হাঁটবার শক্তি একটুও ফিরে এলো না। ঠাকুরদাস বকাবকি করলেন, বললেন তুইতো আনন্দরামকে আসতে দিলি না এখন না হাঁটতে পারলে থাক মাঠের মধ্যে বসে আমি চললুম। দু একঘা চড়চাপড়াও মারলেন, ঈশ্বর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল। তখন বালক ঈশ্বরকে বাধ্য হয়ে কাঁধে নিয়ে চললেন ঠাকুরদাস। তাঁর শরীরও যথেষ্ট শক্তসমর্থ নয়। কিছুটা গিয়ে একবার নামান আবার কাঁধে নেন। তিনদিন পর এই ভাবে বহুকষ্টে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় সিংহি বাড়ীতে এসে পৌঁছলেন।

এবার আবার চিন্তা ঈশ্বরের লেখাপড়ার ব্যাপারে। নানা লোকে নানা পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ বলছে কি হবে ইংরাজী পড়িয়ে আবার কেউ বলছে ইংরাজীটা মোটামুটি জানলে জীবনে করে কম্মে খেতে পারবে। ঠাকুরদাস চান তাঁর ছেলে বিদ্বান হয়ে উঠুক। তাঁর অভাব দূর করবার জন্য চাকরী করার চিন্তা তিনি একদমই করেন না। দেখা হল সম্পর্কে আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতির সঙ্গে। তিনি বললেন চতুষ্পাঠিতে পড়িয়ে কি হবে, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করে দিন।

আপনি যেমনটি চাইছেন তাই হবে। ঠাকুরদাসের এই পরামর্শই মনে ধরল, গিয়ে দেখা করলেন সেখানকার ব্যাকরণের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে তিনি বললেন, ছেলেকে এখানেই ভর্ত্তি করিয়ে দিন, আমি আছি ওর দিকে নজর দিনে পারব। শুরু হল ঈশ্বরচন্দ্রের নতুন জীবন, বয়স তখন মাত্র নয় বছর।

সংস্কৃত কলেজ যেমন বড়, তেমন তার নাম। প্রথমটা একটু হক্‌চকিয়ে গেলেও খুব উৎসাহ পেলেন ঈশ্বর। বাবা ঠাকুরদাস রোজ সঙ্গে করে সকাল নটার সময় বড়বাজার দয়েহাটা থেকে পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজে পোঁছে দিয়ে আসতেন, আবার বিকেল চারটের সময় নিয়ে যেতেন। এতটা পথ রোজ হেঁটেই যাতায়াত করত ঈশ্বর। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তৃতীয় শ্রেণীতে গভীর নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে ব্যাকরণ পড়াতেন। অল্পদিনেই ঈশ্বর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এত অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আর পড়াশোনার প্রতি এত গভীর অনুরাগ আগে কোন ছাত্রের মধ্যে দেখেননি তর্কবাগীশ মশাই। বিদ্যালয়ে কখনও কামাই করেনা ঈশ্বর। মাস দুই গেলো, ঠাকুরদাস বুঝলেন যে এবার ঈশ্বর নিজেই যাতায়াত করতে পারবে। ঈশ্বরও বুঝল বাবার কষ্ট হচ্ছে। তাই সে বাবাকে বলল, বাবা এখন থেকে আমি নিজেই যেতে পারব। খর্বকায় ঈশ্বর যখন একটি ছাতা মাথায় দিয়ে বড়বাজার থেকে পটলডাঙা হেঁটে কলেজ যেত তখন দূর থেকে মনে হত যেন একটি ছাতা হেঁটে যাচ্ছে। ঈশ্বরের মাথাটি ছিল বেশ বড়, তাই অন্যছাত্ররা তাকে 'যশুরে কই' বা 'কসুরে কই' বলে খেপাত। ঈশ্বর প্রচণ্ড রেগে যেতেন। কিন্তু কথার আড়ষ্টতা থাকায় বেশী কিছু বলতে পারতেন না। সংস্কৃত কলেজের সব সেরা ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। শিক্ষকরা ঈশ্বরের মেধার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত, কিন্তু এর পেছনে ঠাকুরদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কড়া শাসনও আছে সর্বদা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজে শয়ণ করেন অতি সাধারণ বিছানায়, পুত্রও শোয় তার পাশে। আর্মানি গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে তুলে দেন। প্রদীপের আলোয় পড়তে বসত, আবার ভোরের আলো ফুটলে ঠাকুরদাস প্রদীপ নিবিয়ে দেন। রোজ রাতে

ঠাকুরদাস কলেজের পড়া মুখস্থ ধরতেন। ভোররাতে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন। পুত্রকে শিক্ষিত করে তুলতে পিতার কি কঠোর পরিশ্রম, তবে সার্থক এ শ্রম। ঠাকুরদাস রাত নটার সময় ফিরতেন তারপর চেলাকাঠ ধরিয়ে রান্না করতেন। পুত্রকে খাওয়াতেন ও নিজে খেতেন। খাওয়া মানে শাকঅন্ন। তরকারী বা মাছ বড় একটা হত না। কোনদিন মাছ হলে শুধু ঝোল দিয়ে খাওয়া হত। পরদিন ওই মাছ দিয়ে আবার অম্বল হত। কলকাতায় বড় একা লাগে। বাড়ীর কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। সিংহবাড়ীর সবাই ঈশ্বরকে ভালবাসে। তবে সবচেয়ে ভালবাসেন জগদ্দুর্লভবাবুর বোন রাইমণি। রাইমণির একমাত্র ছেলে গোপাল ঈশ্বরেরই প্রায় বয়সি। রাইমণি গোপাল আর ঈশ্বরের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখেন না। ওইটুকতো ছেলে নয় বছরের। এত ধকল রোজ সহ্য হত না। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা ঘুমিয়ে পড়তো সে। এই অবস্থায় বাড়ী ফিরে ঠাকুরদাস ছেলেকে দেখলে ভীষণ রেগে প্রহার করতেন। মাঝে মাঝে ঈশ্বরের আর্তচিৎকারে বাড়ীর সবাই ছুটে আসতেন। তাঁরা ঠাকুরদাসকে বলতেন, আপনি ব্রাহ্মণ এভাবে ছেলেকে মারলে এবাড়ীতে ব্রহ্ম হত্যা হয়ে যাবে। আপনি বরং অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন। তখন ঠাকুরদাস থামতেন। এবাড়ীতে ঈশ্বরের একমাত্র আশ্রয়স্থল রাইমণি। যাতে ঘুম না আসে তাই ঈশ্বর প্রদীপের গরম তেল নিয়ে চোখে ঘসে দিত। চোখ প্রচণ্ড জ্বলে উঠত। আবার পড়বার জন্য সব সময় প্রদীপের আলো জ্বালানো সম্ভব হত না তেলের অভাবে। রাস্তার গ্যাসের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে ঈশ্বর, ঠাকুরদাস ঘরে ফেরবার পথে ডেকে নিয়ে যেতেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ভীষণ একগুঁয়ে যা মনে করবে মেরে ধরেও তার থেকে পরিবর্ত্তন করানো শক্ত। ঠাকুরদাস প্রথম প্রথম প্রচুর প্রহার করতেন। কিন্তু তিনি যা বলবেন ঈশ্বর করবে তার উল্টো। ব্যাপারটা বুঝে তিনি উল্টো কথাটা বলতেন আর ঈশ্বরকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত করিয়ে নিতেন। যেমন, আজ মেঘলা, ঠাকুরদাস চাইলেন আর্জ ঈশ্বর স্নান না করুক। তিনি ঈশ্বরকে বললেন, যাও ঈশ্বর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো। ঈশ্বর স্নান করবার

জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, পিতার নির্দেশ শুনে তখনই জামা কাপড় পরে কলেজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। ঠাকুরদাস মনে মনে খুশী হলেন। কিন্তু ব্যপারটা একসময় ধরে ফেললেন ঈশ্বর। বাবা বারণ করেছেন আজ অর্থাৎ ঠাকুরদাস চাইছেন ঈশ্বর তাড়াতাড়ি গঙ্গায় স্নান করে আসুক, প্রায় তেলমাখা হয়েগেছে হঠাৎ মনে হল এটাতো বাবার ইচ্ছায় করা হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসলো সে। ঠাকুরদাস জোর করে জলের মধ্যে নামিয়ে চড়চাপড় মেরেও স্নান করাতে পারতেন না এমনি দিনে। ঠাকুরদাস তাই নাম দিয়েছিলেন ঘাড় কেঁদো, একবার বেঁকলে আর সোজা হয় না। ব্যাকরণের ক্লাসে ঈশ্বর সেরা ছাত্র। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ক্লাশের বাইরেও অনেক উদ্ভট শ্লোক বলতেন। তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে ঈশ্বর সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতো। এই ভাবে এবং বাবার কাছে শিখে ঈশ্বর এরই মধ্যে পাঁচশ শ্লোক মুখস্থ করে ফেলল।

ছুমাস পরেই একটা পরীক্ষা দিয়ে ঈশ্বর পাঁচ টাকা বৃত্তি পেল। তিনবছর পড়তে হয় ব্যকরণ শ্রেণীতে, ছু'বছরের পরীক্ষায় ঈশ্বর অনেকগুলি পুরস্কার পেল। কিন্তু এক বছরের পরীক্ষায় ভাল পুরস্কার পেল না। বাড়ী এসে বাবাকে বলল আমি আর কলেজে পড়ব না। বাবা অবাক হয়ে বললেন কেনরে ? ঈশ্বর বলল এবার একটা বাজে ছেলেকে পুরস্কার দিয়েছে আমাকে দেয়নি। আমি দেশে গিয়ে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসেমশায়ের টোলে পড়ব। ঠাকুরদাস অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেকে ঠাণ্ডা করলেন। শিক্ষকরাও বললেন একবার ভাল হয়নি তো কি হয়েছে পরেরবার হবে। আসলে সাহেব পরীক্ষক প্রথমত ঈশ্বরের জিভের আড়ষ্টতার জন্য হয়ত ভাল করে সব কথা বুঝতে পারেন নি এবং ঈশ্বর প্রশ্নের উত্তর ভাল করে ভেবে নিভু'ল দিত কিন্তু অন্য ছাত্রটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিত। সাহেবের কাছে দ্রুত উত্তরদানকারী বেশী নম্বর পেয়েছিল তা উত্তর ভুল হোক বা ঠিক হোক।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন এগার, ঠাকুরদাস ছেলের উপনয়ণ দেওয়ার ঠিক করলেন। যথারীতি অনুষ্ঠান সহকারে বীরসিংহে ঈশ্বরের উপনয়ণ হল। গাঁয়ে এলে ঈশ্বরের আনন্দ আর ধরে না। ভাই ও

বন্ধুদের সঙ্গে কপাটি খেলা, আরও কত অনন্দ করা। তাই গ্রাম ছেড়ে আবার কলকাতায় যেতে খুব মন খারাপ হত ঈশ্বরের। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ বিভাগে খুব ভাল ভাবে পাঠ সম্পূর্ণ করে সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হল ঈশ্বর। বয়স তখন মাত্র বার। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বললেন, এতটুকু ছেলে সংস্কৃত সাহিত্যের বুঝবেটা কি ? ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আমার পরীক্ষা নিন। বিস্মিত অধ্যাপক কুমার সম্ভব থেকে একটা শ্লোক মুখস্থ বলতে বললেন। ঈশ্বর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গড়গড় করে আবৃত্তি করল। জয়গোপাল এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করাতে ঈশ্বর সঠিক ব্যাখ্যা দিল। এর পর আরও দু একটা প্রশ্নের উত্তরও ঈশ্বর যথাযথ দিল। সকল অধ্যাপকই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। আর কোন প্রশ্ন উঠল না, ঈশ্বর সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলো এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তর্কালঙ্কার মশাইয়ের অতি প্রিয় ছাত্রে পরিনত হল। প্রথম বছরেই ঈশ্বর রঘুবংশ, কুমার সম্ভব ও রাঘব পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ণ করে পরীক্ষায় প্রথম হল এবং পুরস্কার পেল। দ্বিতীয় বছরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়াশেষ করে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পুরস্কার পেল। সংস্কৃত নাটকগুলোর পংতির পর পংতি মুখস্থ বলে যেতে পারতো ঈশ্বর। তার হাতের লেখা ছিল মুক্তর মত।

কিন্তু, এই ঈশ্বরের শুধু কি লেখাপড়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই ? আসলে ঠিক তার উল্টো। বাড়ীতে তখন চারজন। ভাই দীনবন্ধু এসেছে, কাকা কালিদাসও এসেছেন। তাই সকালবেলা বাটনা বাটা কুটনো কোটা রান্নাকরা বাসন মাজা কাঠচেলা করা সবই করতে হয় ঈশ্বরকে, প্রত্যেকদিন স্নান করে বাজার যেতে হত তাকে। এত হাতের কাজ করে তার হাতের নখ ক্ষয়ে গিয়েছিল। এই বয়সে এত পরিশ্রম কি সম্ভব ? যে ঘরে রান্না করত সেই ঘরটি ছিল অত্যন্ত নোংরা। তাছাড়া ঘরটির পাশেই মলমূত্রের জায়গা। মাঝেমাঝেই ক্রিমির মত পোকাগুলো বেয়ে বেয়ে ঘরের মধ্যে চলে আসত। আর

ছিল আরশোলা আর পোকামাকড়। খেতে বসবার সময় ঈশ্বর একঘটি জল নিয়ে বসত। ক্রিমিগুলো এগিয়ে এলে জল ঢেলে ধুয়ে দিতো। একদিন একটা আরশোলা তরকারীর মধ্যে পড়ে গেল। ঈশ্বর কাউকে কিছু বলল না। বললে হয়তো ঘৃণায় সকলেরই খাওয়া নষ্ট হবে। আরশোলাসুদ্ধ তরকারী নিজের পাতেই তুলে নিল। শুধু তাই নয় পাছে পাতের পাশে ফেললে কারুর নজর পড়ে তাই আরশোলা সুদ্ধ তরকারী সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলল। নিজের খাওয়া শুধু ক্ষুধা মেটানোর জন্য, এতটুকু বাহুল্য নেই তাতে। পরণে সেই মা-ঠাকুমার কাটা সূতোয় তৈরী মোটা আর খাটো ধূতি। কিন্তু এমন দয়ালু মন যে সহপাঠীদের কারও কাপড়ের খারাপ অবস্থা দেখলে নিজের পুরস্কারের টাকা থেকে তাদের ভাল বিলতি ধূতি কিনে দিতো। কখনও তার নিজের কাপড় নিয়ে এতটুকুও আড়ম্বরের চিন্তা ছিল না।

এখন ঈশ্বর আরও বড় হয়েছে। সাহিত্য শ্রেণীতে পড়া শেষ হয়েছে। কলেজের সবার মুখে মুখে এখন ঈশ্বরের নাম। সকলেরই ধারণা ঠাকুরদাসের ছেলে মস্তবড় পণ্ডিত হচ্ছে। বাংলা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষাতেও কি অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা ঈশ্বরের। ঠাকুরদাস একদিন ছেলেকে বললেন, আমার ইচ্ছে তুমি বীরসিংহে গিয়ে কলেজের পড়া শেষ করে টোল খুলবে, আমাদের গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েরা ওই টোলে পড়াশোনা করবে। ঈশ্বর বলল, হ্যাঁ বাবা আমারও তাই ইচ্ছা। এদিকে বীরসিংহে ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতির কথা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। মাতা ভগবতী দেবীকে অনেকে ধরলেন ছেলে পণ্ডিত হয়েছে এবার ওর বিয়ে দিন। কথাটা ঠাকুরদাসকে জানাতে ঠাকুরদাসও উদ্যোগী হলেন। তখনকার দিনে অল্প বয়সে বিয়ের প্রচলন ছিল। ঠাকুরদাসের পণ্ডিত পুত্র বিয়ে করবে শুনে নানা জায়গা থেকে পাত্রীর খোঁজ আসতে লাগল। শেষে ক্ষীরপাই-এর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হল। ঈশ্বরের বিয়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বয়স তখন মোটে চোদ্দবছর। কিন্তু বাবা কাকা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা এড়াতে

পারলেন না। শুভদিন দেখে ঈশ্বরের সঙ্গে দীনময়ীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর ঈশ্বর কলকাতায় এসে ভর্ত্তি হলেন অলংকার শ্রেণীতে। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ছিলেন অলংকারের অধ্যাপক, তিনিও ঈশ্বরের আশ্চর্য মেধা দেখে বিস্মিত হলেন। বাৎসরিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান পেয়ে নগদ ও সাতখানা বই পুরস্কার পেয়ে বাড়ী ফিরলেন। ঠাকুরদাস সেদিন একটু দেরী করে বাড়ী ফিরে দেখেন ঘরে ঈশ্বর নেই। একটু রেগেই ডাকতে লাগলেন 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর'। ডাক শুনেই ওপর থেকে তরতরিয়ে নেমে এসে পিতার পায়ের কাছে বইগুলো নামিয়ে প্রণাম করে বলল, বাবা বইগুলো পুরস্কার পেয়েছি অলংকার পরীক্ষায় প্রথম হয়ে। ঠাকুরদাসের বুক আনন্দে ভরে উঠল। এমন সময় এলেন রাইমণি, হাতে রূপোর থালা, থালার ওপর কয়েকটি টাকা ও একজোড়া ধূতি চাদর ও একটি রূপোর গেলাস। ঠাকুরদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এসব কি? রাইমণি বললেন, দাদা এসব ঈশ্বরকে দিলেন। দাদা বললেন ঈশ্বর যে সুনাম অর্জন করেছে তাতে আমাদের বাড়ীরও সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ওকে আমাদেরও পুরস্কার দেওয়া উচিত।

ঠাকুরদাস বাড়ী যাবেন। বললেন, ঈশ্বর, যখন যা বৃত্তির টাকা পেয়েছিস আমার হাতে তুলে দিয়েছিস আমি সব জমিয়ে রেখেছি। এবার তাই দিয়ে একখণ্ড জমি কিনব ভাবছি তোর টোলের জন্য। ঈশ্বর বলল, হ্যাঁ বাবা তাই কর। ঠাকুরদাস দেশে গিয়ে জমি কিনলেন, কিছু হাতে লেখা পুঁথিও সংগ্রহ করলেন। বাবা কলেজে জলখাবারের জন্য কোনও পয়সা দিতে পারতেন না। ছাত্র বৃত্তির টাকা থেকেই বাঁচিয়ে ঈশ্বর যাহোক জলখাবার খেত। কিন্তু একা খেয়ে ঈশ্বরের তৃপ্তি হত না। ওই থেকেই সহপাঠীদের অনেককেই খাওয়াতো। সবাইকে দিতে গিয়ে হয়ত কোনও দিন তার নিজের কিছুই বাঁচতনা। কিন্তু তাতে তার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ হত না। কোন সহপাঠীর অসুখ হয়েছে শুনলে ঈশ্বর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠত। নিজের হাতে সেবা শুশ্রূষা করত। এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীদের কারও

অসুস্থতার খবর পেলে তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করতো। এমনকি মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করতো। একদিন পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে কলেরায় অক্রান্ত পরিবারের চিকিৎসায় সারা রাত জেগে শুশ্রূষা করে গোটা পরিবারকে বাঁচালেন। ঈশ্বরের মন ছিল অসীম দয়ার আধার। যখন দেশে যেতেন তখনও কোথাও অসুখ বিসুখের খবর পেলে স্থির থাকতে পারতেন না।

রাত জেগে পড়াশোনা, সকালবেলা উঠে বাজার করা, বাটনাবাটা, রান্না করা, বাসন মাজা—এত পরিশ্রম ঈশ্বরের সহ্য হল না। ঈশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতায় চিকিৎসায় সুফল না হওয়ায় ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে বীরসিংহে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর ঈশ্বর সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। ভাই দীনবন্ধু তখন দাদাকে বলল, দাদা আমাকে দেখিয়ে দাও আমি রান্না করব। দীনবন্ধু যেটা পারত না সেটা ঈশ্বরই করতেন, আর বাকীটা ভাইকে দেখিয়ে দিলে দীনবন্ধু করত। বাজার তখনও ঈশ্বরই করতেন। একদিন দীনবন্ধু বাজার করতে চাইল। কি কি আনতে হবে ভাইকে সব বলে দিয়ে ঈশ্বর বাজারে পাঠালো, কিন্তু রাত এগারটা হয়ে গেল দীনবন্ধু তখনও ফিরল না। ঠাকুরদাস বাড়ী ফিরে ঈশ্বরকে বকাবকি করতে লাগলেন দীনবন্ধুকে বাজারে পাঠানোর জন্য। ভাইয়ের বিপদের কথা ভেবে ঈশ্বর কেঁদে ফেললেন। তারপর বেরলেন ভাইয়ের খোঁজে। জোড়াসাঁকোর নতুন বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজাখুজির পর দেখতে পেলেন দীনবন্ধু একটা দোকানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ডেকে তুলে ভাইকে বাড়ী নিয়ে এলেন ঈশ্বর।

এই সময় ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঈশ্বর ল'কমিটির সার্টিকিকেট পেলেন। এত অল্পবয়সে কেউ এই গৌরব অর্জন করতে পারেনি। ত্রিপুরায় একটি জজ পণ্ডিতের পদ শূণ্য হলে ঈশ্বর আবেদন করলেন, কিন্তু মনেমনে ভাবলেন এত অল্প বয়সে কি এই পদ. কর্তৃপক্ষ তাকে দেবে ? কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন চিঠি ও নিয়োগপত্র এসে উপস্থিত হল। কিন্তু বাদ সাধলেন ঠাকুরদাস, তিনি এতদূরে এই অল্প

বয়সের ঈশ্বরকে পাঠাতে রাজী হ'লেন না। স্বভাবতই ঈশ্বর একটু বিমর্ষ হলেন ঠাকুরদাস তাকে বুঝিয়ে বললেন, দেখ ঈশ্বর, বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাতে পারলে জীবনে তোমার চাকরীর অভাব হবে না। অনেক ভাল চাকরী তুমি পাবে। ঈশ্বরের মন শান্ত হল।

অলংকারের পর এবার বাকি রইল বেদান্ত, ন্যায় আর দর্শণ। বেদান্তের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতিভা দেখে অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতিও মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি সত্যি ঈশ্বর। দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। সর্বোৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার জন্য যে পুরস্কার ছিল সেই একশত টাকা করে, পুরস্কার দুটি ঈশ্বরই লাভ করলেন। সমস্ত অধ্যাপকদের বিবেচনায় ঈশ্বেরর রচনাই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হল। বাবার হাতে পুরস্কারের দুশো টাকা তুলে দিলে আনন্দে ও গর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে উঠল।

এদিকে বিপদ হল আশ্রয়স্থলের। জগর্দ্দুলভ কি একটা চোরা কোম্পানীর কাগজ কেনার দায়ে গ্রেপ্তার হলেন, তার কারাদণ্ড হল। ঈশ্বর ভাইকে নিয়ে পাতুলে মামার বাড়ী গিয়ে দুমাস রইলেন। জগর্দ্দুলভের বিরুদ্ধে মামলা মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় তিনি অচিরেই মুক্তি পেলেন। কিন্তু এতে তাঁর ব্যবসার খুব ক্ষতি হল, ফলে তিনি ঘরগুলি ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। ঠাকুরদাসকে বললেন—সবইতো বুঝতে পারছেন, তিনতলার ঘরগুলো ভাড়া দিতে হল। এখন আপনি একতলায় কোনের ঘরটিতে থাকতে পারেন, কোনও ভাড়া দিতে হবে না। ঠাকুরদাস রাজী হলেন। কিন্তু ঘরটি ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। এখানে থাকতে থাকতে অল্পকিছু দিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র আবার অসুস্থ হলেন। ডাক্তার দেখে বললেন যে অবিলম্বে সেই ঘর না ছাড়লে রোগমুক্তির আশা নেই। ঠাকুরদাস অনেক চেষ্টা করে বউবাজার অঞ্চলে একটি ঘর পেলেন, পঞ্চানন তলায় আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়ী। সেই খানেই হল নতুন বাসস্থান।

বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি অতিবৃদ্ধ। ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্র স্নেহে ভাল বাসেন। ঈশ্বরও পিতার মতই ভক্তি করেন শম্ভুচন্দ্রকে।

শম্ভুচন্দ্রের স্নান, আহার সব কাজেই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বর বিনা দ্বিধায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে সাহায্য করেন, যখন ডাকেন তখনই যান। রোগে বা অসুস্থতায় সেবা শুশ্রূষা করেন। শম্ভুচন্দ্র কথায় কথায় বলেন, ঈশ্বর আমার ছাত্র নয়, পুত্র। একদিন শম্ভুচন্দ্র ঈশ্বরকে বললেন, ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়সে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে এত কষ্ট হত না। সবাই আমাকে বলছে আবার বিয়ে করবার জন্য। ঘরে স্ত্রী থাকলে আর এত কষ্ট হবে না। কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঈশ্বর। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই বৃদ্ধ, যে কোনদিন যাঁর মৃত্যু হতে পারে তিনি চাইছেন আবার বিয়ে করে সংসার পাততে। যে নারীকে ঘরে আনবেন বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তার কি হবে? এই কথা চিন্তা করে ঈশ্বর শিউরে উঠলেন। অধ্যাপককে বললেন আপনি এমন চিন্তা আর মনের মধ্যে স্থান দেবেন না। —তাহলে আমাকে দেখবে কে? —কেন আমরাতো আছি। কিন্তু তোমরা তো সব সময় কাছে থাকতে পারবে না। ঈশ্বরের মুখ দিয়ে অপ্রিয় কথা এবার বেরিয়ে এলো, আপনিওতো চিরকাল বাঁচবেন না। বিব্রত অধ্যাপক বললেন, তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। ঈশ্বর নির্দ্বিধায় জানান যে তারা কুপরামর্শই দিচ্ছে। ঈশ্বর আশাকরে ছিলেন যে শম্ভুচন্দ্র তার পুনর্বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করবেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শুনলেন যে শম্ভুচন্দ্র বারাসতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করেছেন। বিশেষ করে যখন শুনলেন যে, কন্যাটি শম্ভুচন্দ্রের নাতনির বয়সী ও সুন্দরী এবং খুবই অল্প বয়স। তখন তাঁর মন বেদনায় ভরে উঠল। একদিন শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি কলেজে ঈশ্বরকে ডেকে বললেন, তোমার মাকে একদিন দেখতে গেলে না। ঈশ্বর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বাচস্পতির একান্ত অনুরোধে একদিন যেতেই হল। যাবার আগে কলেজের দ্বারোয়ানের কাছ থেকে দুটো টাকা ধার নিলেন। ঘোমটায় মুখ ঢাকা বালিকা বধূর সামনে ঈশ্বর স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর প্রণাম করে পায়ের কাছে দুটি টাকা রেখে

যাবার জন্য উদ্যত হলেন। একটি মেয়ে এসে ঘোমটাটি খুলেদিল। ঈশ্বর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লজ্জায় অবনত নববধূর সুন্দর মুখখানিও বিষাদে মলিন রূপ ধারণ করেছে। ঈশ্বর আর নিজের চোখের জলকে রাখতে পারলেন না। বাচস্পতি বিব্রত হয়ে বললেন, এ গৃহের অকল্যাণ করিস না। অন্য ঘরে হাত ধরে প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে গেলেন, অধ্যাপক অনেক কথা ও যুক্তির অবতারনা করে ঈশ্বরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। এরপর ঈশ্বর যাবার জন্য তৈরী, এদিকে অন্দর মহল থেকে মিষ্টান্ন এসেছে। শম্ভুচন্দ্র বললেন, যাও বাবা একটু মিষ্টি মুখ করেনাও। ঈশ্বরচন্দ্র একটু তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, আপনার গৃহে আমি আর জলস্পর্শ করব না। একথা বলেই প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মেজভাই দীনবন্ধুর বিয়ে দিলেন ঠাকুরদাস। তাতে খরচ খরচায় বেশ কিছু ঋণ হল ঠাকুরদাসের। ফলে কলকাতার খরচ যথাসাধ্য কমান হল। দুধ মাছ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হল। বিকেলে জলখাবার সামান্য ছোলা আর বাতাসা। এই সময় কিছুদিন তাদের অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু কোনও কষ্টই কষ্ট নয় ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে। তিনি কেমন করে দুঃখের অবসান ঘটানো যায় সেই চেষ্টা ও চিন্তা করতেন। বেদান্ত পাঠ শেষ, ন্যায় ও দর্শন পড়া শুরু হয়েছে। ন্যায় দর্শনের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমনির দৃষ্টিও পড়েছে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ঈশ্বরের ওপর। খুবই যত্নের সঙ্গে প্রিয়ছাত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন শিরোমনি মহাশয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই নিমচাঁদ শিরোমনির মৃত্যু হল। তখন কলেজ পরিচালকদের সমস্যা হল কাকে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক নিয়োগ করবেন? তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন, জয়-নারায়ণ তর্করত্নই সবচেয়ে যোগ্য শিক্ষক, তাঁকেই ন্যায় দর্শনের অধ্যাপক নিয়োগ করা হোক। ঈশ্বরের প্রস্তাবই ইংরেজ অধ্যক্ষ মেনে নিলেন। এর কিছু দিন পর দুমাসের জন্য ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ খালি হল। মার্শাল সাহেব অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করলে তাঁরা বললেন

যে তুমাসের জন্য অন্য অধ্যাপক নিয়োগের প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরচন্দ্রকেই দায়িত্ব দেওয়া হোক অধ্যাপনার। মার্শাল সাহেবও এই প্রতিভাবান ছাত্রটিকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে ওই সম্মানীয় দায়িত্বের কথা বললেন। ঈশ্বর রাজী হলেন, শুরু হল একাধারে ছাত্র ও অধ্যাপক রূপে ঈশ্বরচত্রের অভিজ্ঞতা লাভ। এ এক তুলর্ভ সম্মান। অন্য কেউ এমন সম্মান লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ ?

প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে ঈশ্বর তখন সমস্ত ছাত্র অধ্যাপকের কাছে এক অতি আদরনীয় নাম। কিন্তু অধ্যাপনায় যে ঈশ্বর কিছুমাত্র কম যান না তা প্রমাণ করলেন সসম্মানে। আশি টাকা বেতন পেলেন তুমাসে। বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বাবা আপনি এই টাকা নিয়ে তীর্থ করে আস্থন। ঠাকুরদাসের অনেক দিনের ইচ্ছে গয়ায় গিয়ে পিতৃ পিণ্ডদান করা। এবার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। ঠাকুরদাস শুভদিন দেখে বেরিয়ে তীর্থ ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করে কলকাতায় ফিরে এলেন। ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষায় ঈশ্বর প্রথম হয়ে একশতটাকা পুরস্কার পেলেন। এছাড়া ভাল হাতের লেখার জন্য আট টাকা ও আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পঁচিশটাকা পুরস্কার পেলেন। সবটাকাই তিনি পিতার হাতে তুলে দিলেন। ঠাকুরদাস কিছু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই টাকায় তার অনেকাংশই শোধ হল।

বীরসিংহ গ্রামবাসীরাও ঈশ্বরের জন্য গর্বিত। যখন ঈশ্বর গ্রামে যেতেন তখন গ্রামের পণ্ডিত ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। নানা বিষয়ে অনেকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হত, সকলেই ঈশ্বরের যুক্তি মেনে নিতেন। তখন থেকেই অসাধারণ যুক্তিবাদী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। একবার কুরাণ গ্রামবাসী দর্শন শাস্ত্রবিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সঙ্গে ন্যায় শাস্ত্র নিয়ে তর্ক প্রতিযোগিতা হয় এবং তর্কসিদ্ধান্ত মশাইয়ের পরাজয় ঘটে। জয়লাভ করেও ঈশ্বর গর্বে অভিভূত হয়ে পড়েননি। ঠাকুরদাস খবর পেয়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে ঈশ্বরের মাথায় দিলেন। ঈশ্বর নিজের তুঃখে যেমন বিচলিত হতেন না, তেমনি

প্রশংসায় গর্ব করতেন না। তবে অন্যের দুঃখে যারপরনাই বিচলিত হতেন। ঈশ্বরের সখ বলতে ছিল কবিগান শোনার। দেশে বন্ধুদের ও ভাইদের নিয়ে কবিগান হচ্ছে শুনলে শুনতে যেতেন, সারারাত কবি গানের আসরে কাটিয়ে দিতেন।

দেখতে দেখতে বার বছর কেটে গেল ঈশ্বরের সংস্কৃত কলেজে। কলেজের শেষ পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন ঈশ্বর। সংস্কৃত কলেজের সকল অধ্যাপকই এমন একজন ছাত্রকে বিদ্যায়তনে পেয়ে গর্বিত। প্রখ্যাত ও সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বললেন, এমন একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছাত্র আমাদের তথা সমগ্র দেশের গৌরব। এই গৌরবের পাত্রকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা উচিত। সবাই তাঁর কথায় সায় দিলেন। বাচস্পতি বললেন এমন অসাধারণ একজনকে সাধারণ উপাধি দেওয়া যায় না। দিতে হবে বিশেষ উপাধি। কি উপাধি দেওয়া যায় তাই নিয়ে সমস্ত অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতিকেই পথ নির্দেশ দিতে অনুরোধ করলেন। শম্ভুচন্দ্র বললেন, বিদ্যাকে যে বক্ষে ধারণ করেছে—সে 'বিদ্যাসাগর'। সেই উপাধিই স্থির হল ঈশ্বরের জন্য। এক পরম শুভলগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঐতিহাসিক সেই উপাধি পত্রে স্বক্ষর করলেন ছয়জন বিখ্যাত অধ্যাপক। এই উপাধি হয়ে দাঁড়াল সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নাম। এই নাম বিদেশেও পোঁছে গিয়েছিল।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত হবার পর এবার বিদ্যাসাগরের কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করার পালা। সেই সময়ে সমগ্রদেশ ছিল এক অন্ধকারময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবে গোটা জাতি স্বমহিমায় প্রতিভাত হতে পারে নি। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু রয়ে গেছে বালবিধবাদের চরমতম দুঃখ কষ্টের প্রবাহ। একাদশীতে একফোঁটা জলের জন্য আট নয় বছরের বিধবা যখন জল জল করে কাতর আর্তনাদ করছে, তখনই হয়ত বয়স্ক বা প্রায় বৃদ্ধ সেই বাড়ীরই অন্য ঘরে বালিকা স্ত্রীর সঙ্গ লাভে সময় অতিবাহিত করছে। সমাজ আর এগোতে পারছিল তখন, ঠিক যেমন নদীতে পলি পড়ে জোয়ার ভাঁটা প্রায় বন্ধ

করে দেয়, তেমনই আমাদের সমাজও প্রায় বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল। এদিকেআবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এসেছে। কিন্তু সে স্রোতেও আমাদের অচলায়তন সমাজকে প্রভাবিত করে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। উদারচেতা কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙালীর চেষ্টায় যে হিন্দু কলেজ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিও এক সময় নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় বাংলাদেশে নতুন করে ইংরাজী শিক্ষা শুরু হল। এই পটভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর রূপে অবতীর্ণ। বিদ্যাসাগরই বটে, তবে সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষায়। নতুন ইংরাজী শিক্ষার স্রোতে যারা গা-ভাসিয়ে দিয়েছেন তারা ব্যস্ত ইংরাজের আচার ব্যবহারের নির্বিচার অনুকরণে ও আত্মীকরণে, আর বিদ্যাসাগর প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে জাতিকে আধুনিকতার চেতনায় চৈতন্য দান করতে ব্যস্ত।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বিদেশী ভাবধারার প্রবর্ত্তক, আর সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক। এই দুই ভিন্ন স্রোতোধারাকে যদি সমন্বয় সাধন করা যায় তবেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আধুনিক চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করা সম্ভব এই কথা উপলব্ধি করলেন বিদ্যাসাগর। তিনি নিজে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। শুধু ইংরাজী নয় সেই সঙ্গে হিন্দীও। তখন কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইংল্যাণ্ড থেকে সে সব রাজকর্ম্মচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করতে আসতেন তাদের এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ফারসী শিখতে হতো। এই চারটি ভাষায় উত্তীর্ণ হলে তবে তারা চাকরী পেতেন, নচেৎ দেশে ফেরত যেতে হতো। মধুসূদন তর্কালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেডপণ্ডিত। বৃদ্ধ এই পণ্ডিতমশাইয়ের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হল। কলেজের সেক্রেটারী তখন মার্শাল সাহেব, এই পদের জন্য যোগ্য লোকের সন্ধান করতে লাগলেন। মার্শাল সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন থেকেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষন করতেন। দু'মাসের জন্য সংস্কৃত কলেজে

ব্যাকরণ বিভাগে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাপনার ক্ষমতারও যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। এই প্রতিভাধরই হবেন সবচেয়ে উপযুক্ত এই কথা ভেবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের খোঁজ করতে লাগলেন। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সবে পাঠ সমাপন করে বীরসিংহে বিশ্রাম করছেন। মার্শাল সাহের একদিন সংস্কৃত কলেজে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। শুনে জয়নায়ায়ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন এই গৌরবময় পদ ঈশ্বর পাবে শুনে আমরাও গর্বিত বোধ করছি, আমি এখন ঈশ্বরের পিতা ঠাকুরদাসের বাসায় গিয়ে তাঁকে খবর দিচ্ছি। ঈশ্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডপণ্ডিত হবে, এ ঠাকুরদাসের কল্পনার মধ্যে ছিল না। আনন্দে অভিভূত হয়ে ঠাকুরদাস ছুটলেন বীরসিংহে ছেলেকে খবর দিতে। বিদ্যাসাগরও এই গৌরবময় পদ প্রাপ্তির সংবাদে খুব খুশী হলেন এবং ১৮৪১ সনের শেষের দিকে একুশ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডপণ্ডিত পদে যোগ দিলেন। মাহিনা মাসে পঞ্চাশ টাকা। বিলেত থেকে আগত চাকরী অভিলাসীদের পরীক্ষা নেবার ভার পড়ত বিদ্যাসাগরের ওপর। তিনি যেভাবে পরীক্ষা নিতেন তাতে অনেক পরীক্ষার্থীই বিফল হতো। একদিন মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন যে পরীক্ষার আঁটা-আঁটিটা একটু কম করলে হয় না। বিদ্যাসাগর মুখের ওপর বললেন ওটি আমায় দিয়ে হবে না, না হয় চাকরী ছেড়ে দেব কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারব না। মার্শাল সাহেব এই নির্ভীক বক্তব্যে রাগ করার পরিবর্তে খুশীই হলেন। বললেন তাহলে সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষার পরীক্ষাটা একটু হালকা করলে ক্ষতি কি? বিদ্যাসাগর বললেন, আচ্ছা সেটা বরং ভেবে দেখতে পারি। চাকরীর মায়া করে আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ বা কোনও অন্যায় মেনে নেওয়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বিদ্যাসাগর বাবাকে বললেন, বাবা আপনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আর আপনাকে চাকরী

করতে হবে না এখন আমার ইচ্ছা আপনি চাকরী ছেড়ে বাড়ীতে গিয়ে বাস করুন। ঠাকুরদাস বললেন, চাকরী ছাড়লে সংসার চলবে কি করে। বিদ্যাসাগর বললেন, আপনাকে আর একটুও কষ্ট করতে দিতে চাই না, আমি মাসে মাসে আপনাকে কুড়ি টাকা করে পাঠাব, তাই দিয়ে আপনি সচ্ছন্দে সংসার ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। ঠাকুরদাসের শরীরও দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে আসছিল, কিন্তু সংসারের একান্ত প্রয়োজনের জন্য চাকরী করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এখন পুত্রের ইচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে গিয়ে অবসর জীবনযাপন করতে লাগলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী নেওয়া থেকেই বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভালভাবে ইংরাজী শেখা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি সাহেবদের বাংলা পড়ান, তাদের সঙ্গে সহজভাবে ইংরাজীতে কথা বলতে না পারলে পাশ্চাত্য চিন্তা ও প্রাচ্য চিন্তার সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে না এবং যুগোপযোগী শিক্ষাক্রমও সম্পূর্ণ হবে না। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলায় থাকতেন। তিনি ছিলেন হেয়ার ইস্কুলের শিক্ষক ও ভাল ইংরাজী জানতেন। বিদ্যাসাগর একদিন কথায় কথায় তাঁকে বললেন, বাঁড়ুজ্যে আমাকে ইংরাজী শেখাতে পারো? দুর্গাচরণ অবাক হয়ে বললেন, চাকরী করছ এখন আবার ইংরাজী শিখতে চাও কেন? বিদ্যাসাগর তখন কারণ জানালে দুর্গাচরণ বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শেখাতে রাজী হলেন। বিদ্যাসাগর মাইনে দিয়ে একজন হিন্দী শিক্ষকও রাখলেন। চাকরী, আবার যুগপৎ ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা চলতে লাগল বিদ্যাসাগরের। দুর্গাচরণ পরে খুব একটা সময় পেতেন না তাই তাঁরই ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে ঠিক করে দিয়েছিলেন। তারপর রাজনারায়ণ গুপ্তর কাছেও ইংরাজী শিক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর। রাজনারায়ণকে মাসে পনের ও হিন্দী শিক্ষককে মাসে দশ টাকা বেতন দিতে হত। সকাল ও সন্ধ্যে বেলায় অনেক ছাত্র বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত, কাব্য ও ব্যকরণ পড়তে আসত। সারাদিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজ। কিন্তু এর মধ্যেও অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর

ইংরাজী ও হিন্দী দুটি ভাষাই ভালভাবে আয়ত্ত করে নিলেন।

এর পর বিদ্যাসাগরের বিশদভাবে অঙ্ক শেখার সখ হল। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তের জামাতা অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে অঙ্ক শিখতে লাগলেন। কিন্তু কিছু দিন শেখার পর বিষয়টি নীরস মনে হওয়ায় আর বেশী দূর এগোলেন না। তবে একদিন এই অঙ্ক শিখতে যাওয়ার অবসরেই পরিচয় হয়েছিল রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে। আনন্দকৃষ্ণের ঘরে যাওয়ার পথে বিদ্যাসাগরকে দেখে একজনকে রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, এই দীপ্ত চেহারার যুবকটি কে হে? ওকে ডেকে আনো তো। লোকটি বিদ্যাসাগরকে জানাতে আনন্দকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে রাধাকান্তের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিদ্যাসাগর। আনন্দকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর? হ্যাঁ, নামটা আগে শুনেছেন বেশ কয়েকবার, কিন্তু এই প্রথম আলাপ ও চাক্ষুষ পরিচয় হল। একটু আলাপ করেই বুঝলেন হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরই বটে।

কর্ম্মজীবনের শুরুতেই বিদ্যাসাগর কঠিন আঘাত পেলেন অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির মৃত্যুতে। বৃদ্ধের তরুণী বধূর গা থেকে তখনও বিয়ের গন্ধ যায়নি, বৈধব্য এলো জীবনে, চলে গেল জীবনের সকল আশা ও সুখের স্বপ্ন। এই তরুণীর বিধবা বেশ দেখে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন ভাবতে পারলেন না এর পরিণাম কি হবে। দেশের বিধবাদের দুঃখে বিদ্যাসাগরের চোখের জল এক দিনের জন্যও সারা জীবনের মধ্যে শুখোয়নি। এই অশ্রুধারা থেকেই শুরু হয়েছিল এদের দুর্দশা মোচনের উপায় অন্বেষণের অক্লান্ত প্রয়াস।

পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা বিদ্যাসাগর পাঠান বাবাকে, আর বাকী ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসার যাবতীয় খরচ চালাতে হয়। কলকাতার বাসায় তখন লোক নেহাত কম নয়, মোট নয়জন। বিদ্যাসাগরের রোজগারেই সম্পূর্ণ খরচ চলে। রান্নাবান্না পালা করে করতে হয়। বিদ্যাসাগর এখনও পালা অনুযায়ী নিজে হাতেই রান্না

করেন। তাঁরা তখন থাকেন বৌবাজারে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে।

এই বাড়ীতে সকাল বিকেল নানান মানুষ আসেন তাঁর কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি পড়তে। বিদ্যাসাগর পালা করে অত কাজের মধ্যেও বিদ্যা বিতরণ অক্লান্ত ভাবে করে চলতেন। একদিন এলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয়রামের নাতি। বললেন, আমি সংস্কৃত শিখব। তখন সংস্কৃত শিখতে হত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ে। সেভাবে শিখতে অনেক সময় লাগে। রাজকৃষ্ণের বয়স ছাত্র হিসাবে একটু বেশী, তাই বিদ্যাসাগরকে বললেন, শেখার তো খুব ইচ্ছা, কিন্তু পারবো কি? বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, কেন পারবে না? রাজকৃষ্ণ বললেন, মুগ্ধবোধ পড়ে সংস্কৃত শিখতে বহু সময় লেগে যায়, বেশ কয়েক বছর হয়ত সময় লাগবে শিখতে। অন্য কোনও সহজ উপায় নেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার? বিদ্যাসাগর ভাবতে লাগলেন এবং এক রাতের মধ্যেই উপায় তৈরী করে ফেললেন। পরদিন রাজকৃষ্ণ এলে তাকে বললেন, এই নাও তোমার সমস্যার সমাধান। কত ক্ষমতা থাকলে বিরাট সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিবর্ত্তে একরাতের মধ্যে বিকল্প ব্যাকরণ তৈরী করে ফেলা সম্ভব তা সাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। সেই অসাধ্য সাধন করে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শেখার সহজ দ্বার খুলে দিলেন। তৈরী করলেন উপক্রমণিকা, সংস্কৃত শিক্ষার এই কঠিন বাধা দূর হল এক আশ্চর্য সৃজনশীল কর্ম্মীর একটি রাতের প্রচেষ্টায়।

বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের জুনিয়ার পরীক্ষায় বসবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কিছু দিন পর বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন যে, এক গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই জুনিয়ার বৃত্তি পেয়ে সংস্কৃত কলেজে পড়ছেন। রাজকৃষ্ণ ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছেলেটির বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। রাজকৃষ্ণ একটু দমে গেলেন। বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে সিনিয়র পরীক্ষা দিতে উৎসাহ দিয়ে বললেন, আমি তোমায় পাঠ তৈরীতে সাহায্য করব। বিদ্যাসাগর

যখন ভরসা দিয়েছেন তখন রাজকৃষ্ণ মহা উৎসাহে প্রস্তুত হতে লাগলেন। মার্শাল সাহেবও বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি বাংলায় কথা বলতেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে বাংলায় চিঠি দিলে মার্শাল সাহেবের পড়তে কোনও অসুবিধা হত না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরীতে শুধু নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি কলেজের যাতে উন্নতি হয় তার জন্য সর্ব্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার তখন প্রাথমিক পর্ব চলেছে, লর্ড হার্ডিঞ্জ ছিলেন বড়লাট, তিনি একদিন এলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শণে। এই সময় জেলায় জেলায় বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হতে লাগল সরকারী তরফে। আর শিক্ষাবিভাগের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হল "কাউন্সিল অব এডুকেশন"-এর ওপর। লর্ড হার্ডিঞ্জ মার্শাল সাহেবের কাছে শুনেছেন শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের অসীম আগ্রহের কথা। লর্ড হার্ডিঞ্জের মনেও শিক্ষা-বিস্তারের একটা পরিকল্পনা ছিল। তিনি এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাইলেন। বিদ্যাসাগর এই সময় বাংলা ভাষার সাহায্যে ইউরোপীয় সমাজরীতি ও ভাবধারা বাংলার সমাজ জীবনে প্রচলিত করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি দেখলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকরী পাওয়ার তেমন কোনও সুযোগ নেই। আগে জজপণ্ডিতের চাকরী তবু ছিল, এখন তাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংস্কৃত শিক্ষায় আগ্রহ ক্রমে কমে আসছে। সরকারেরও এদিকে তেমন নজর নেই। বিদ্যাসাগর বড়লাটকে বললেন—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য কিছু কি করা যায় না? লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরকে বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন? বিদ্যাসাগর তখন তাঁর পরিকল্পনার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জকে জানাতে গিয়ে বললেন, সংস্কৃত কলেজে এমন পাঠক্রম হওয়া উচিত যে, যারা শুধু সংস্কৃতে নয় সর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ হবে এবং যাদের মন হবে সংস্কার মুক্ত। হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন। বিদ্যাসাগর আগেই ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এবং

তাঁর সমর্থন পেয়েছিলেন। এরপর লর্ড হার্ডিঞ্জ ও হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে লাগলেন।

দেশের মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসবার জন্য বিদ্যাসাগরের এক সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল, কারণ তিনি বুঝেছিলেন মানুষকে শিক্ষিত করতে না পারলে এই কুসংস্কারের কৃতদাসত্ব থেকে সমাজকে মুক্ত করা যাবে না। একশ একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হল এবং বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা মত ঠিক হল সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রই এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করবে। শিক্ষকদের নির্বাচন ও নিয়োগের ভার দেওয়া হল মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগরের ওপর। বিদ্যাসাগরের কাজের বোঝা খুব বেড়ে গেল, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল। এই সময় সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূণ্য হলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিযুক্ত হলেন। শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ডাঃ মোয়াট ও মার্শাল সাহেব পরামর্শ করে ঠিক করলেন বিদ্যাসাগরই অন্যটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। এই পদের বেতন নব্বই টাকা। বিদ্যাসাগর বর্ত্তমানে পাচ্ছেন পঞ্চাশ টাকা। নিঃসন্দেহে এক অতি লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু মানুষটা যেখানে বিদ্যাসাগর সেখানে সাধারণ হিসাব চলে না। প্রস্তাবটা কানে আসতেই বিদ্যাসাগরের মনে পড়ে গেল বন্ধু তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির কথা। ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি কাজের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য তারানাথের নাম প্রস্তাব করলেন। মোয়াট সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন-সে কি এতো বেশী মাইনে অথচ আপনি রাজী হচ্ছেন না? বিদ্যাসাগর বললেন আমি চাই একজন যোগ্য লোক তার যোগ্য মর্যাদা পাক। মোয়াট সাহেব বললেন, আগামী সোমবারের মধ্যেই লোক চাই, কিন্তু তারানাথ তর্কবাচস্পতি তো এখানে নেই। সোমবার সকাল দশটার মধ্যে

আবেদন পত্র পৌঁছান চাই। বিদ্যাসাগর বললেন বেশ সেই ব্যবস্থাই করব। যেদিন এই আলোচনা হয় সেদিন ছিল শনিবার। তর্ক বাচস্পতি থাকতেন কালনায়, কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে, অথচ যাতায়াতের কোনও ভাল ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তাঁর কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরেই সন্ধ্যা নাগাদ বিদ্যাসাগর রওনা হলেন কালনা অভিমুখে পদব্রজে। সারারাত হেঁটে পরদিন দুপুর বেলায় তিনি কালনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্যাপার দেখে তর্কবাচস্পতির তো বাকরুদ্ধ। তাঁকে খবর দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরের এই অতিমানুষিক কাজের, এত কষ্ট স্বীকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলেন না তারানাথ। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নে তারানাথ জানালেন, যা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব তা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি তাঁর ভগ্ন শরীর নিয়ে কাল কলকাতায় গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারবেন না। তখন বিদ্যাসাগর একটা আবেদন পত্র লিখিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরপর দুদিন সারারাত্রি হাঁটা, ফেরার পথেও সারারাত্রি হেঁটে বেলা সাড়ে দশটার সময় হাজির হলেন মোয়াট সাহেবের কাছে তারানাথ তর্কবাচস্পতির আবেদন পত্র হাতে নিয়ে। মোয়াট সাহেবও বিস্মিত হয়ে গেলেন। এমন অসম্ভব ব্যাপার যে ঘটতে পারে মোয়াট সাহেবের কল্পনার মধ্যে তা ছিল না। বিদ্যাসাগরের পরোপকারের প্রবৃত্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কতবড় হৃদয়বত্তা ও পৌরুষ থাকলে এ জিনিস সম্ভব। অনেকে পরোপকারের চেষ্টা করেন ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ করে আত্ম প্রসাদ লাভ করবার জন্য, কিন্তু একদিকে নিজের প্রায় দ্বিগুণ মাসিক আয় করবার সুযোগ যোগ্য বন্ধুকে অনায়াসে দিয়ে এবং অন্যদিকে তাঁর আবেদন পত্র ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবার জন্য এত ক্লেশ নেওয়া কোনও মানুষের পক্ষেই প্রায় সম্ভব নয়। এ শুধু বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ আর অক্ষয় মনুষ্যত্বের পক্ষেই সম্ভব।

সেজভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে। চিঠিতে লিখেছেন বিশেষভাবে

বীরসিংহে যেতে, বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন বাড়ী যাবেন। মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইতে মার্শাল বললেন, পণ্ডিত এখন যে রকম কাজ পড়েছে, এখন তোমাকে ছুটি দিতে পারব না। বিদ্যাসাগর বললেন, ভাইয়ের বিয়ে মা যেতে লিখেছেন, মাত্র দুদিনের ছুটি দিলেই চলবে। মার্শাল বললেন, এখন তোমার একদিনের জন্যও যাওয়া উচিত নয়। এই সময় তুমি গেলেই কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বিষণ্ণ মনে বিদ্যাসাগর বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ীতে ভৃত্য শ্রীরাম ছাড়া আর কেউ নেই। মায়ের ডাকে যেতে পারবেন না, মনটা হুহু করতে লাগল। সারারাত চোখে ঘুম এলো না বিদ্যাসাগরের। ভোরবেলা উঠেই মার্শাল সাহেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর। সাহেব বললেন, কি ব্যাপার পণ্ডিত, তুমি এই সময় এলে ? বিদ্যাসাগর বললেন মা যেতে বলেছেন, আমাকে যেতেই হবে। মার্শাল বললেন, কিন্তু এই সময় তোমাকে কি ভাবে ছুটি দিই বলতো ? বিদ্যাসাগর বললেন, ঠিক আছে ছুটি দিতে না পারেন চাকরী ছেড়ে দিয়ে যাব। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের উত্তর শুনে তাঁর মনের দৃঢ়তা ও মাতৃভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বললেন পণ্ডিত তোমায় চাকরী ছাড়তে হবে না, তোমায় ছুটি দিলাম।

অত্যন্ত আনন্দিত মনে বিদ্যাসাগর বাড়ী ফিরে শ্রীরামকে বললেন, তৈরী হও বাড়ী যাব। শ্রীরাম তো অবাক, যাওয়া হবে না মনে করে হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল। বিদ্যাসাগর খাওয়া দাওয়া সেরে শ্রীরামকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, পথঘাটের অবস্থা খুব সঙ্গীন, হাঁটতে হচ্ছে অতিকষ্টে। বিদ্যাসাগর দেখলেন যে বয়স্ক শ্রীরামের বেশ কষ্ট হচ্ছে, তাই বললেন, তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তুমি কলকাতায় ফিরে যাও। বিদ্যাসাগরকে একলা ফেলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না শ্রীরামের, কিন্তু পথের অবস্থা দেখে ফিরে আসতে হল। হাঁটতে হাঁটতে দামোদর নদের তীরে এসে পৌঁছলেন বিদ্যাসাগর। বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে দামোদর। ওপারে যাওয়ার কোনও খেয়া নৌকা নেই তখন এপারে। কখন আসবে তারও

কোনও ঠিক নেই। আর নৌকো পেলেও আজ রাতে বাড়ী পৌঁছান হয়ে উঠবে না। মা ডেকেছেন তাই আজ রাতেই বাড়ী পৌঁছতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্রকে। পাড়ে যারা ছিলেন তাদের সকলের সাবধান বাণী ও বারণ উপেক্ষা করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্যাসগর। প্রচণ্ড স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে ওপারে পোঁছলেন তিনি। আবার শুরু হল হাঁটা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার পড়ল দ্বারকেশ্বর নদ, দামোদরের মতই ভয়ঙ্কর এর রূপ। আবার এখানেও এমন অবস্থা যে, পারাপার হবার নৌকো নেই, মায়ের নাম স্মরণ করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে, সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠলেন।

এরপর আবার হাঁটা শুরু হল। পথে পথে দস্যুর উৎপাতের ভয়ও রয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুই টলাতে পারল না দৃঢ়চিত্ত বিদ্যাসাগরকে। অতি দুর্গম সেই পথ অতিক্রম করে বীরসিংহে পৌঁছালেন বিদ্যাসাগর, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বাড়ীতে তখন কেউ নেই, সারা বাড়ী নিস্তব্ধ, শুধু মাত্র জননী জেগে আছেন, নীরবে চোখের জল ফেলছেন, আর ভাবছেন ঈশ্বর তো এলো না। এমন সময় হঠাৎ 'মা' 'মা' ডাকে চমকে উঠলেন ভগবতী দেবী, ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখেন ভেজা গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঈশ্বর। আনন্দে আর গর্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন ভগবতীদেবী, বললেন, এত দেরী করলি বাবা ওরা যে সব চলে গেছে বিয়ের আসরে। তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের জন্যে, নিজেও কিছু মুখে দেননি। মা ছেলে খেতে বসলেন আর সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগলেন। মা শুনলেন তাঁর ঈশ্বর কিভাবে মায়ের ডাকে ছুটে এসেছে। দুজনের চোখই আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল।

একদিন শোভাবাজারে আনন্দকৃষ্ণের কাছে সেকসপীয়র পড়ছেন বিদ্যাসাগর, হঠাৎ সেখানে উপস্থিত কৃশতনু কিন্তু উজ্জ্বল, দীপ্ত চেহারার এক যুবক। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হলে আনন্দকৃষ্ণ পরিচয় করিয়ে দিলেন—এ হলো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

অক্ষয় কুমার দত্ত এর লেখাই সেদিন আপনি সংশোধন করে দিয়েছেন। অক্ষয় কুমারের নাম বিদ্যাসাগর শুনেছেন আগে কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় এই প্রথম হল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান উপেক্ষা করার মত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভা উল্লেখ-যোগ্য স্বাক্ষর রেখে গেছে। সেই সময় কলকাতায় যে সামাজিক আলোড়ন দেখা দেয় তার ফলে নানা সভা সমিতির সৃষ্টি হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর তখন ছাত্র। বিদ্যাসাগর কালক্রমে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন, সভ্য হলেন এবং শুধু তাই নয় পরবর্ত্তী কালে সম্পাদকও হলেন। বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভায় আসেন ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। এভাবেই অক্ষয় কুমারকেও একদিন দেবেন্দ্রনাথের কাছে এনেছিলেন গুপ্তকবি ঈশ্বর গুপ্ত। এভাবেই গড়ে উঠেছিল এক চমৎকার মধুচক্র। তবে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভায় এসেছিলেন ধর্মের আকর্ষণে নয় সাহিত্যের টানে। অক্ষয় কুমারেরই উৎসাহে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলায় মহাভারতের অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এর আগে এমন সুন্দর বাংলা লেখা আর প্রকাশিত হয়নি। আদি পর্বের কিছু অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এমন সময় বিদ্যাসাগর শুনতে পেলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর পর বিদ্যাসাগর যোগ্য হাতেই কাজের ভার পড়েছে মনে করে লেখা বন্ধ করলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত লিখে যশ ও সুনাম অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরও মহাভারত লেখা চালিয়ে গেলে হয়ত তাঁর ভাগ্যে এই যশোলাভ ঘটত না একথা মহাত্মা কালী-প্রসন্ন অকপটে স্বীকার করে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের দয়া ও মহত্ত্বের কোনও তুলনা নেই। দয়া ও মহত্ত্ব শব্দ দুটি একসঙ্গে মিশে গেছে বিদ্যাসাগরে। অক্ষয় কুমারও ছিলেন বিদ্যাসাগরের মতই দরিদ্রের সন্তান। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল তৎকালীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রিকা, আর

এর সম্পাদনার কাজে অক্ষয় কুমারকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। ফলে অক্ষয় কুমার কঠিন শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে এবং চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে অক্ষয় কুমার-কে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরীর পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলল। যে সব সিভিলিয়ান এদেশে আসতেন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ নিতেন তারা বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। স্কট নামে একজন সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল, তিনি একদিন বিদ্যাসাগরকে একটি সংস্কৃত কবিতা লিখে দিতে বললেন। বিদ্যাসাগর তখনই একটি সংস্কৃত কবিতা রচনা করলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোকগুলির অর্থ স্কট সাহেব বুঝতে পারলেন না। পরে অনুবাদ করে মানে বুঝিয়ে দেওয়ায় স্কট সাহেব এত খুসী হলেন যে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দুশো টাকা পুরস্কার দিলেন। বিদ্যাসাগর সে টাকা নিজে নিলেন না। সংস্কৃত রচনার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার চার বছর পঞ্চাশ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এর কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যা-লঙ্কারের মৃত্যু হলে পদটি শূণ্য হয়। সম্পাদক রসময় দত্তের ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পদটিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাহিনা মাত্র সেই পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগর ওই বেতনে রাজী হবেন কিনা তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটের কাছে বিদ্যাসাগরকে সহ-সম্পাদক করবার প্রস্তাব করে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ সহ পাঠালেন। ডঃ মোয়াট ওই পদের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করছিলেন, তিনি ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। মার্শাল বললেন যে সংস্কৃতে সত্যিকারের পণ্ডিত ও ইংরাজীতে ভাল দখল আছে, এমন একজন ব্যক্তিই তো আছেন। কৌতূহলী মোয়াট জিজ্ঞাসা করলেন, কে সেই ব্যক্তি? মার্শাল বললেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কে? মোয়াট বললেন, রসময় দত্তও এঁর কথাই বলেছেন, এঁকেই ওই পদে নিযুক্ত করতে চাই। মোয়াট

নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাসাগরকে ওই পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোনও আশ্বাস দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর চাকরী নিতে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ রসময় দত্তের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত এবং ওঁর কার্য্যকলাপে বিদ্যাসাগর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। একজন যোগ্য মানুষ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হলেও তিনি তাঁকে অধ্যাপকের চাকরী না দিয়ে লাইব্রেরিয়ানের চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেব আর ডঃ মোয়াটকে ধরে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীয়ানের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাই বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন যে, যদি মতান্তর হয় তবে আমি চাকরী ছেড়ে দেব। কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে কাজ করতে পারব না। মার্শাল বললেন—বেশ পণ্ডিত তাই হবে। তখন বিদ্যাসাগর বললেন—আমার একটা শর্ত আছে, আমি কাজ ছাড়তে বাধ্য হলে আমার বাবা খুবই অসুবিধায় পড়বেন। আমার মেজোভাই দীনবন্ধু পণ্ডিত লোক, তাকে যদি আপনি আমার বর্তমান পদ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার (হেডপণ্ডিত) পদে নিয়োগ করেন তাহলে আমি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিতে পারি। মার্শাল সাহেব তাতেই রাজী হলেন। বিদ্যাসাগরের আর চাকরী নিতে কোনও বাধা রইল না, পঞ্চাশ টাকা বেতনেই তিনি সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদক পদে যোগ-দিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তার শূণ্যস্থানে গেলেন ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ঢুকেই এর শ্রীবৃদ্ধিতে নজর দিলেন। নামেই কলেজ, পাকা দালানে অবস্থিত টোল ছাড়া আর কিছুই নয়। হাতে লেখা পুঁথিগুলি জরাজীর্ণ, সেগুলি সংস্কার করার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া কলেজের কাজ কর্ম্মেও চরম বিশৃঙ্খলা চলেছে। কি ছাত্র কি অধ্যাপক কারোরই কলেজে আসা বা যাওয়ার কোনও সময়ের ঠিকঠিকানা নেই। অধ্যাপকরা পড়ান বিছানায় বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পড়াতে পড়াতে তাঁরা বহু সময়েই ঘুমিয়ে পড়েন। এ

অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের যেমন সেই ছাত্রাবস্থায় তেমনই বর্তমানেও। বিদ্যাসাগর প্রথমেই কলেজ শুরু এবং সমাপ্তির সময় নির্দিষ্ট করে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। কলেজ শুরু সকাল দশটায় ও ছুটি বিকেল চারটায়। আগের মত আর ছাত্ররা যখন খুসী আসা বা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এতকাল পড়া চলাকালীনও ছাত্ররা ইচ্ছামত যাওয়া আসা করত। কয়েকজন অধ্যাপক এ সত্ত্বেও দেরী করে আসছেন দেখে বিদ্যাসাগর দশটা বাজলেই প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাধ্য হয়ে অধ্যাপকরাও ঠিক সময়ে আসতে আরম্ভ করলেন। সংস্কৃত কলেজ এখন একটি সুশৃঙ্খল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিনত হল।

একদিন বিদ্যাসাগর একটা কাজে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 'কার' সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হিন্দু কলেজে গিয়েছেন। কার সাহেব তখন ইজিচেয়ারে বসে সামনের টেবিলে পা দুটি তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত হলেও তিনি যথারীতি বসে রইলেন। বিদ্যাসাগর কোনও মতে কাজের কথা বলে অত্যন্ত অপমানিত হয়ে চলে এলেন। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। কিছুদিন পর কার সাহেব কোনও কাজে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কার সাহেব আসছেন খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি তাঁর বাঁকাচটি সমেত পাদুটি সামনের টেবিলের ওপর তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। কার সাহেব এসে এই ব্যাপার দেখে মনে মনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়াতাড়ি কাজের কথা বলে চলে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডাঃ মোয়াটের কাছে অভিযোগ পাঠালেন। কার সাহেবের অভিযোগ মোয়াট সাহের অবহেলা করতে পারেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর তৈরী হয়েই ছিলেন। তিনি কৈফিয়তের উত্তরে জানালেন যে তিনি তো এই আদবকায়দা সভ্য দেশের মানুষ কার সাহেবের কাছেই শিখেছেন, সেই শিক্ষা মতই তিনি কার সাহেবকেও অভ্যর্থনা করেছেন। এতে তাঁর কোনও অন্যায় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। ডঃ

মোয়াট চিঠির উত্তর নিয়ে নিজেই সোজা কার সাহেবের কাছে উপস্থিত হলেন। সব জেনে বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মান বোধ ও মনের জোরের পুনঃ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি কার সাহেবকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন। কার সাহেবও তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এর পর কার সাহেব আর একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করলেন। ব্যাপারটা ওই খানেই শেষ হল। সংস্কৃত কলেজে এই সময় সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূণ্য হয়। মোয়াট সাহেবের ইচ্ছা বিদ্যাসাগরকেই এই পদে নিয়োগ করার। বেতন নব্বই টাকা, বিদ্যাসাগরের বর্তমান বেতনের চেয়ে চল্লিশ টাকা বেশী। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই পদ নিতে চাইলেন না। তিনি মনে করলেন সংস্কৃত কলেজের অভ্যন্তরীন ত্রুটি ও গলদগুলি দূর করবার জন্য তিনি যে প্রয়াস পাচ্ছেন এতে তার ক্ষতি হবে। সংস্কৃত কলেজের উন্নয়নের স্বার্থে অনেক বেশী বেতন লাভের সুয়োগ ছেড়ে দিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে এই পদ দেওয়া হোক। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরীটি পেলেন মদনমোহন।

এদিকে বিরাট উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সংস্কারের পরিকল্পনা রচনা করে সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে পেশ করলেন। রসময় ব্যাপারটায় খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না, তবু নিয়ম মাফিক পরিকল্পনার প্রধান প্রস্তাবগুলি শিক্ষাপরিষদে পেশ করলেন এবং আশা করলেন শিক্ষাপরিষদ এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু হল ঠিক উল্টো। শিক্ষাপরিষদ বিদ্যাসাগরের রচিত উন্নত পঠন পদ্ধতির পরিকল্পনা প্রস্তাবে বিনা দ্বিধায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবিষয় ও রুটিন অনেক পাল্টে গেল। এত পরিবর্তনের বহর দেখে রসময় দত্ত নিজের কৃর্তৃত্ব হ্রাসের আশংকায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং নিজের ক্ষমতাবলে বিদ্যাসাগরের অনেক প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের কাছে এ অন্যায় অসহ্য। তিনি কলেজের

উন্নতির জন্যই তো এত সব করতে চেয়েছিলেন। ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না বিদ্যাসাগর। তিনি ঠিক করলেন চাকরী ছেড়ে দেবেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবরা শুনে অবাক। তারা বলল চাকরী ছাড়লে খাবে কি? বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন—মুদীর দোকান করবো, দরকার হলে আলু পটল বেচবো, তবু অন্যায়ের সঙ্গে আপস করব না। ডাঃ মোয়াট অনেক অনুরোধ করলেন, এমনকি রসময় দত্তও অনেক বোঝালেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এক গোঁ, চাকরী তিনি ছেড়ে দিলেন, কেউ তাঁর মত ফেরাতে পারল না। চাকরী ছেড়ে দিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়লেন বিদ্যাসাগর। কলকাতার বাসায় অনেক অনাথ ছেলে আহার করত। বিদ্যাসাগর তাদের বিদায় দিলে হয়ত খরচ কমত, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাদের পূর্ব্ববৎই রেখে দিলেন। কলকাতার বাসার খরচ ভাই দীনবন্ধুর আয় থেকেই হতে লাগল, আর বিদ্যাসাগর প্রতি মাসে ধার করে বাবাকে টাকা পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? হঠাৎ বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন বই লিখবেন। তাহলে হয়ত অভাব কিছুটা মিটবে। এই সময় মোয়াট সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে বললেন, পণ্ডিত, আপনি তো বসেই আছেন আমার কয়েকটি বন্ধুকে একঘণ্টা করে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী পড়ান না। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন এবং পড়ালেন ছয়মাস। মোয়াট সাহেবের বন্ধুরা সব চাকরী পেয়ে নানান যায়গায় চলে গেলেন এবং যাবার সময় চারশত টাকা দিলেন বিদ্যাসাগরকে, বিদ্যাসাগর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—ওটাকা আমি নিতে পারি না। আপনারা মোয়াট সাহেবের বন্ধু আর ওনার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে, কাজেই বন্ধুর কাজ করে আমি টাকা নেব কি করে? অথচ সেই সময় বিদ্যাসাগর যথেষ্ট অর্থকষ্টে ভুগছেন এবং দেনাও হয়েছে প্রচুর, কিন্তু শিষ্টাচার বহির্ভূত হবে বলে সাহেবদের কাছ থেকে কোনও টাকা নিলেন না। বই লিখতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। আগেই তাঁর এ অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অল্প সময়ে সংস্কৃত শেখার জন্য কয়েক রাত্রির মধ্যেই 'উপক্রমনিকা' লিখে, ফোর্ট উইলিয়াম কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরীতে যোগ দেওয়ার পরেই বাংলা

গদ্য পুস্তক লেখবার অনুরোধ করলে তিনি রচনা করেন 'বাসুদেব চরিত্র'। সেইটাই বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম বাংলা রচনা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বইটি প্রকাশিত হয়নি। মার্শাল সাহেব একদিন অনুরোধ করেন হিন্দী 'বেতাল পচ্চিসীর' বাংলা অনুবাদ করতে। বিদ্যাসাগর শুরু করে দিলেন কাজ। বাংলা ভাষায় বের হল 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। কিন্তু প্রথমে খুব একটা সমাদর না হলেও ক্রমে ক্রমে বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই বই থেকেই বলা যায় বাংলা ভাষায় নবযুগের সূচনা হল। এরপর বিদ্যাসাগর পরপর লিখলেন "বাংলার ইতিহাস" গ্রীস প্রভৃতি দেশের বীরগণের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে "জীবন চরিত"।

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেল। এই সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের পদ শূণ্য হলে মার্শাল সাহেবের অনুরোধ ও আহ্বানে বিদ্যাসাগর ওই পদে আশি টাকা বেতনে যোগ দিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন ও সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের পরীক্ষার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। এমনকি বিখ্যাত জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ রোয়ার, যিনি অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন, তিনিও সংস্কৃত প্রশ্নপত্র তৈরীতে বিদ্যাসাগরের সাহায্য নিতেন। এই সব কাজের বিনিময়ে যে বাড়তি আয় বিদ্যাসাগরের হত তা তিনি নিজের জন্য খরচ করতেন না, কোন না কোনও সৎকাজে ব্যয় করতেন। সে বছর যে ছেলেটি সংস্কৃত কলেজে সিনিয়র পরীক্ষায় কাব্যে ও অলঙ্কারে প্রথম হল —বিদ্যাসাগর তাকে এক সেট মহাভারত কিনে দিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরী বিদ্যাসাগরকে বেশীদিন করতে হল না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে গেলে সেই শূণ্য পদে বিদ্যাসাগরকে যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াট অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর সহসা রাজী হলেন না। বললেন—আমার ওপর এখন অনেক কাজের ভার। কিন্তু ডঃ মোয়াটের বার বার অনুরোধ ফেলতে না পেরে বললেন যদি শিক্ষা পরিষদ তাঁকে অধ্যক্ষের মর্যাদা সহযোগে

সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ দেয় তবে তিনি কাজে যোগ দিতে পারেন। মোয়াট তাতেই রাজী হলেন, কারণ ওই পদে বিদ্যাসাগরই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তখন ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাস। রসময় দত্ত তখনও সম্পাদক, তবে কলেজের শৃঙ্খলার দিকে তাঁর কোনও নজর নেই। শিক্ষাপরিষদ এইসব লক্ষ্য করেই বুঝলেন যে পুরোনো সম্পাদককে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। বিদ্যাসাগরকেই বললেন রিপোর্ট তৈরী করতে কি ভাবে সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হতে পারে এবং তার বর্তমান অবস্থাই বা কি? বিদ্যাসাগর তো মনেপ্রাণে চান শিক্ষার প্রগতি, তাই অনেক চিন্তা ভাবনা ও পরিশ্রম করে তৈরী করলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত রিপোর্ট যা আজকের দিনেও শিক্ষাক্ষেত্রে এক মহান পথ নির্দেশ। বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, সেই সঙ্গে যুগ-প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে হবে। ছাত্রদের কণ্ঠ থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে আসুক কালিদাস ও সেক্সপীয়ার।

ডঃ মোয়াট বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতার ও সংগঠনী শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন এবং রিপোর্টটি শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হল। রসময় দত্ত দেখলেন এখন আর প্রতিপত্তির সঙ্গে কাজ করা যাবে না তাই পদত্যাগ করলেন। এতকাল সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের দ্বারা কলেজের অধ্যক্ষের কাজ পরিচালিত হত, রসময় পদত্যাগ করায় দুটি পদ এক করে অধ্যক্ষের নতুন পদ সৃষ্টি করা হল। দুটি পদের বেতন যথাক্রমে একশো ও পঞ্চাশ টাকা একসঙ্গে যোগ করে বেতন হল দেড়শো টাকা এবং এই পদে নিযুক্ত হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পদে অধিষ্ঠিত হয়েই বিদ্যাসাগর সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। তবে নিয়ম শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। এককালে এই কলেজেরই ছাত্র তাই সর্বময় কর্তা হয়েও

বিদ্যাসাগর প্রবীণ অধ্যাপকের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না কিন্তু অধ্যাপকদের দেরী হলে তিনি মূল ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং প্রশ্ন করে বসেন 'এই এলেন বুঝি'? এতে অধ্যাপকগণ লজ্জিত হয়ে ঠিক সময়ে আসা শুরু করলেন।

তখন সংস্কৃত কলেজ শুধু ছিল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের জন্য। বিদ্যাসাগর এসেই এই নিয়ম তুলে দিলেন। এখন সকল জাতের ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে। কলেজে আগে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত না। ফলে অনেক ছাত্র সুযোগ সুবিধা পেলেই অন্য ইংরাজী স্কুলে চলে যেত। বিদ্যাসাগর এই প্রবণতা কমানোর জন্য এবং সত্যিকারের আগ্রহী ছাত্ররাই যাতে পড়ে সেই জন্য প্রবেশ দক্ষিণা দুটাকা ধার্য করলেন। কোনও কারণে নাম কাটা গেলেও আবার এই দক্ষিণা দিয়ে কলেজে প্রবেশ করতে হত। এর ফলে অস্থিরচিত্ত ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হল এবং কলেজ সুশৃঙ্খল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে আবার গৌরবান্বিত হল।

বিদ্যাসাগর একশো টাকা মাইনা দিয়ে প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারীকে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক করে নিয়ে এলেন। গুনীর মর্যাদা দিতে কখনও কার্পন্য করেন না বিদ্যাসাগর।

এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রবর্তন হলে সংস্কৃত কলেজ থেকেও বিদ্যাসাগর কয়েকজন ছাত্রকে পাঠালেন এবং তারা ভালভাবেই উত্তীর্ণ হল। গরমে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ভীষণ কষ্ট হয় তাই বিদ্যাসাগর প্রবর্তন করলেন গরমের সময়ে দুমাস ছুটি। এখনও যে গরমের ছুটি হয় বিদ্যাসাগরই তার প্রবর্তক।

এই সময় বিদ্যাসাগর আরও কয়েকটি বই লিখলেন। আগে লেখা উপক্রমণিকা এবার ছেপে বার হল তা ছাড়া সহজ ভাবে সংস্কৃত পড়বার জন্য পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি থেকে কাহিনী নিয়ে তিনখণ্ডে বই লিখলেন ঋজুপাঠ।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হওয়ায় কতৃপক্ষও তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিলেন। তাঁর বেতন বেড়ে

হল তিনশো টাকা। তবে বেতনের সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়ল।

বিদ্যাসাগর ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দ্যোগে ইতিপূর্বে যে পাঠশালাগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সেগুলিরও তখন শোচনীয় অবস্থা। এই সময় বাংলার ছোটলাট হয়ে এলেন ফ্রেডরিক জে হ্যালিডে। ইনি শিক্ষা পরিষদেরও সদস্য। নতুন করে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চলতে লাগল। বিদ্যাসাগরই তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মডেল স্কুল স্থাপনের। এই সময় তাঁকে তাঁর কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত করে। তাঁর বেতন হয় মোট পাঁচশো টাকা। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকেই দায়িত্ব দিলেন বিদ্যালয়গুলির স্থাপনের স্থান নির্বাচন করবার।

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে হ্যালিডে সাহেবকে রিপোর্ট দিলেন। বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে নতুন উদ্যোগ শুরু হল। আর এই উদ্যোগের প্রাণ পুরুষ হলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। নানা জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের যোগ্য ভাবে গড়ে তুলতে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় স্থাপিত হল নর্মাল স্কুল। এই সময় শিক্ষা পরিষদ পরিবর্তিত হয়ে হল ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্টাকশান। ডঃ মোয়াটের জায়গায় ডিরেক্টর হয়ে এলেন তরুণ সিভিলিয়ান গর্ডন ইয়ং।

ছুটির সময় বিদ্যাসাগর দেশে গিয়ে বাবাকে বললেন, বাবা, আমি বীরসিংহে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করব। বাবা খুসী হয়ে অনুমতি দিলে বিদ্যাসাগর সেই দিনই বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন করে ফেললেন এবং পরদিন ভিত্তিস্থাপন করবেন স্থির করলেন। কিন্তু পরদিন মজুর পাওয়া না গেলে বিদ্যাসাগর নিজেই কোদাল হাতে মাটি কাটতে নেমে গেলেন। সঙ্গে এলেন দুই ভাই দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র। দৃশ্য দেখে গাঁয়ের মানুষ না এসে পারলেন না। তারাও এগিয়ে এলেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুল তৈরী হয়ে গেল। বীরসিংহ ও আশপাশের গ্রামে বহু ছেলে বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভর্ত্তি হল।

বিদ্যালয়ের নাম রাখলেন বিদ্যাসাগর, ভগবতী বিদ্যালয়।

শুধু তাই নয় গরীব চাষী ও মজুরদের ছেলেরা যাতে পড়তে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এখানে ছাত্রদের পড়বার কোনও খরচ দিতে হত না এমনকি বই কাগজ কলম বা শ্লেট পেন্সিল বা স্কুলের শিক্ষকদের মাহিনা এসব খরচও বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত ভাবে বহন করতেন। তিনি নিজে বেতন পান তিনশো আর কিছু বই থেকে আয়। তার থেকেই সব খরচ চালাতে হয়। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। প্রচুর বিদ্যালয় তো স্থাপন হল বিদ্যাসাগরের উৎসাহে সরকারী উদ্যোগে কিন্তু বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শকতো চাই। বিদ্যাসাগর ছাড়া একাজের আর কেই বা আছেন সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁকেই এই কাজের ভার দেওয়া হল। তাঁর যাতায়াতের জন্য সরকার দুইশত টাকা রাহা খরচ প্রতি মাসের জন্য মঞ্জুর করলেন।

বিদ্যাসাগর কখনও হেঁটে কখনও পালকীতে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতেন। পথে কোন পীড়িত লোককে পড়ে থাকতে দেখলে তৎক্ষণাৎ নেমে তাঁর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন বা পালকীতে তুলে নিতেন। সঙ্গে তিনি সিকি আধুলি টাকা প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা সঙ্গে রাখতেন যাতে প্রয়োজন মত মানুষকে সাহায্য করতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। এভাবে যে কত দান বিদ্যাসাগর করেছেন মানুষকে, তার কোনও হিসাব নেই।

এদিকে যেমন তাঁর বিরাট হৃদয় মানুষের দুঃখে মুহূর্তে বিগলিত তেমনি আবার কোথাও বিশৃঙ্খলা বা অন্যায় দেখলে তিনি তেমনি কঠোর। তরুণ কালীচরণ ঘোষকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিয়োগ করেছিলেন। বয়স কম বলে ছেলেরা ক্লাশে গোলমাল করত, ঠিকমত পড়ান সম্ভব হত না কালীচরণের। আবার কেউ কেউ তাঁকে কলেজ থেকে তাড়াবার চেষ্টাও করেছিলো। বিদ্যাসাগর একদিন ক্লাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে—তোরা কে কে কালীচরণকে কলেজ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিস ? কেউ স্বীকার না করায় বিদ্যাসাগর সবাইকে ক্লাশ থেকে বের করে দিলেন। ছেলেরা কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যাসাগরের নামে নালিশ করল। ভাবল এবার বিদ্যাসাগরকে সত্যি সত্যিই দাঁড়ি

পাল্লা ধরতে হবে, বিদ্যাসাগরের নিশ্চয় চাকরী যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকেই বিচারের দায়িত্ব দিলেন, তখন ছাত্রদের মুখ শুকিয়ে গেল। অভিভাবকরাও ভীত হয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন—ছেলেদের কালীবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে বলুন। ছেলেরা ক্ষমা চাইলে সব মিটে গেল। বিদ্যাসাগর মৃদু হেঁসে বললেন— ওরে মুখ্যুরা, দাঁড়িপাল্লা কে ধরবে?

একবার বিদ্যাসাগর অধ্যাপক তারাকুমার কবিরত্নের ওপর একটু অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন তখন কবিরত্নের বাড়ী গিয়ে তাঁকে বললেন—তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি কি করলে তার খণ্ডন হবে বলো? কবিরত্ন বললেন— সাগর, আমি জানি সাগরের বাষ্প হতেই মেঘের সৃষ্টি আর তারই বর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়। তোমার হৃদয়ের এই বেদনার বাষ্পেই আমি শীতল হয়েছি। তুমিতো শুধু বিদ্যার সাগর নও দয়ার সাগরও।

একদিন বিদ্যাসাগর একটা কলেজের কাজে এক জায়গায় গেছেন। কিন্তু কলেজের সময়ের মাত্র আধঘণ্টা দেরী। বাসায় গিয়ে চান খাওয়া করে কিছুতেই দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছতে পারা যাবে না। তিনি দেখলেন তারাকুমার কবিরত্নের ছাত্ররা যে বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে সেই বাড়ীটা পথেই পড়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন, ছেলেদের স্নান হয়ে গেছে এবার খেতে বসবে। তিনি একটু তেল চেয়ে নিয়ে পাতকূয়া থেকে জল তুলে দুচার ঘটি মাথায় ঢেলে চট্‌পট স্নান সেরে নিয়ে একটা পাতা নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বসে পড়লেন। বামুন ঠাকুর ও ছেলেরাতো অধ্যক্ষকে দেখে সন্ত্রস্ত। বিদ্যাসাগর এরপর একটু ভাত ডাল ও তরকারী চেয়ে নিলেন ও নিমেষে কোনমতে মুখে গুঁজে উঠে পড়লেন ও হাত মুখ ধুয়ে চটি পরে হন্ হন করে কলেজের মুখে রওনা দিলেন। ছেলেরাও তাড়াতাড়ি কলেজে পৌঁছে দেখে, অধ্যক্ষ তাদের আগেই ঠিক সময়ে দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছে নিজের আসনে বসে আছেন। এমনই ছিল বিদ্যাসাগরের সময় জ্ঞান, নিয়মনিষ্ঠা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা।

এদেশে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তখন মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন ছিল না। মেয়েদের পড়াশোনা করানো ধর্ম বিরোধী বলে প্রচার করা হত। ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার বেথুন বড়লাটের পরিষদের আইন সভার সদস্য হয়ে আসেন। পরে তিনি শিক্ষাপরিষদের সভাপতিও হন। সে যুগের কয়েকজন প্রগতিশীল বাঙালীর সহযোগিতায় বেথুন সাহেব কলকাতায় একটি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটিই পরে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত হয়। বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন। বেথুন নিজে ছিলেন মাতৃভক্ত ও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই বিদ্যাসাগরের অন্তরের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন যে স্ত্রীজাতির যদি উন্নতি না হয় তাহলে জাতির উন্নতি হতে পারে না, আর তার জন্য সর্ব প্রথম চাই মেয়েদের শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে দিলেন। এর জন্য তাঁকে কম কটুক্তি সহ্য করতে হয়নি। তখন লোকে রসিকতা করে বলে—বাপরে বাপ মেয়েরা লেখা পড়া শিখলে কি আর রক্ষে আছে? অনেকে সরাসরি বিরোধিতাও করতে লাগল। কিন্তু দমবার পাত্র বিদ্যাসাগর নন, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি কাজে লেগে পড়লেন। বেথুন সাহেব সবসময় বিদ্যাসাগরের চেষ্টার পেছনে রয়েছেন।

কিন্তু এদেশের জন্য কাজ করতে গিয়েই বেথুন সাহেবের মৃত্যু হল। কলকাতা থেকে বারমাইল দূরে জনাইতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শনে যাবার সময় প্রবল বৃষ্টিতে পথঘাট কাদায় ভরে গেলে গাড়ী আর চলতে পারল না। হেঁটে প্রবল বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে অবস্থায় বহু কষ্টে বেথুন সাহেব পৌঁছলেন জনাইতে, কিন্তু নিদারুণ নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অল্প কয়েকদিনের রোগ ভোগের পর তাঁর অমূল্য জীবনদীপ অকালে নিভে গেল। তাঁর মৃত্যু সংবাদ বিদ্যাসাগরের কাছে দারুণ আঘাত নিয়ে এলো। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে মানুষটির ওপর, তাঁর মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা মডেল স্কুল খুলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিলেন, এরপর তিনি মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই সব স্কুলের সরকারী সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগর ইয়ং সাহেবকে চিঠি লিখলেন। ইয়ং সাহেবও ভারত সরকারের কাছে সাহায্য দান মঞ্জুর করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভারত সরকার তখন শিক্ষা প্রসারের জন্য উদার নীতি গ্রহণ করেননি ফলে এই আবেদন মঞ্জুর হল না। এতে বিদ্যাসাগর মনে খুবই আঘাত পেলেন। কিন্তু তিনি এতে না দমে ভারত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে পাবলিক ইনষ্ট্রাকশানকে কড়া চিঠি লিখতে লাগলেন।

একবার গরমের ছুটিতে বিদ্যাসাগর দেশের বাড়ীতে আছেন, এমন সময় বাড়ীতে ডাকাত পড়ল। ডাকাতরা প্রায় সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেল। কোনওরকমে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিদ্যাসাগর জীবন রক্ষা করলেন। কিন্তু দারোগা যখন তদন্ত করতে এলেন দেখেন, বিদ্যাসাগর ভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে মহানন্দে কপাটি খেলছেন। দারোগা তো বিস্মিত। এত বড় বিপর্যয়েও কোনও রেখাপাত করেনি বিদ্যাসাগরের মনে।

কলকাতায় এলে ছোটলাট হ্যালিডে সব শুনে বললেন—আপনি তো বড় কাপুরুষ, ডাকাত পড়ল বাড়ীতে আর আপনি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন? বিদ্যাসাগর বললেন এখন তো এই কথা বলছেন আর এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করে মারা পড়লে বলতেন, ইস লোকটা কি বোকা। হ্যালিডে আর কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুব হৃদ্যতা ছিল। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন, লাটভবনে বিদ্যাসাগরের অবাধ গতিবিধি ছিল। শহরের গণ্যমান্য লোক লাটভবনে হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করতে এসে হয়ত অনেকক্ষণ বসে আছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর এলে লাটসাহেব তাঁকে তক্ষুণি ডেকে নিতেন। এতে

উপস্থিত লোকেরা মনক্ষুণ্ন হলেন এবং পরে হ্যালিডে সাহেবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—সবাই আসে নিজের কাজে আর পণ্ডিত আসেন অন্যের কাজে। কাজেই তাঁকে আগে ডেকেছি বলে আমার কোনও দোষ হয়েছে বলে মনে করি না। হ্যালিডে সাহেবের ইচ্ছায় প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য লাটভবনে যেতেন। পরনে তাঁর চিরাচরিত ধুতিচাদর ও বিদ্যাসাগরী চটি। হ্যালিডে সাহেবের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁরই পাঠান সাহেবি পোষাক পরে একদিন লাটভবনে গেলেন। পরে সাহেবকে বললেন—সাহেব এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা। সাহেব কারণ জানতে চাইলে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, এরকম যন্ত্রণাদায়ক পোষাক পরে সং সেজে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন পণ্ডিত আপনার যদি এই পোষাক পরে আসতে খুব কষ্ট হয় তবে আপনি আপনার মনের মতন পোষাক পরেই আসবেন। এর পর থেকে বিদ্যাসাগর আপন পোষাকেই লাট ভবনে গিয়ে জাতীয় পোষাকের মর্যাদা রক্ষা করে ছিলেন।

হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের হৃদ্যতা থাকলেও কাজের ব্যপারে পরের দিকে ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না। ইয়ং সাহেব তার পদাধিকার বলে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিদ্যাসাগরের নীতি ও কার্য্যকলাপের সমালোচনা করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন। ওদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিও সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল। বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন যে চাকরী ছেড়ে দেবেন। তিনি ডিরেক্টরকে বললেন, আমি অবসর নিতে চাই, তিনমাস পরেই আমি পদত্যাগ পত্র পেশ করব। চিঠির প্রতিলিপি তিনি ছোটলাট হ্যালিডের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়েই হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর একান্ত অনুরোধে আরও এক বছরের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে থাকতে রাজী হলেন। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল বিদ্যাসাগর তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। এতো শুধু পদত্যাগ পত্র নয়,

অন্তরের সমস্ত সঞ্চিত মান অভিমানের এক জ্বলন্ত প্রকাশ। পদত্যাগ পত্রে তিনি লিখলেন—আমি আর যতদিন বাঁচবো সেই সময়টা দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখা পড়া শিখে শিক্ষিত হয় তার জন্য চেষ্টা করবো, আর সেই ব্রত আমার মৃত্যুর পরে আমার শ্মশানের ছাইয়ে মিশে সার্থক হবে। হ্যালিডে তাঁকে ডেকে বললেন, পণ্ডিত আপনার উদ্দেশ্যে অতি মহৎ। কিন্তু যে সব কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন ও জড়িয়ে পড়েছেন তাতে তো অনেক অর্থের প্রয়োজন। আপনি চাকরী ছাড়লে অর্থাভাবে কষ্ট পাবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন, চাকরী আমি ছাড়বই। বয়স তখন আটত্রিশ। পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। মনে তাঁর প্রচণ্ড উদ্যম, শরীরেও প্রচুর কর্মক্ষমতা। শুরু হল বিদ্যাসাগরের জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর চাকরী ছাড়ায় বন্ধু বান্ধব ও হিতাকাঙ্খী আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। দেশে সবাই বলাবলি করতে লাগল, একগুঁয়ে বামুন এবার মারা পড়বে। বিদ্যাসাগর এসব মন্তব্যে বিচলিত হলেন না। দেশে বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে তাঁর হিতাকাঙ্খী কমছিল না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক স্যার জেমস কলভিন বিদ্যাসাগরকে পরামর্শ দিলেন আইন ব্যবসা করবার। নামকরা উকিল দ্বারকা নাথ মিত্রের বাড়ীতে এই ব্যাপারে পরামর্শ করতে বারকয়েক গিয়ে বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে এই কাজে বিস্তর মিথ্যে কথার প্রয়োজন হয় আর ভালভাবে আইন ব্যবসা করতে গেলে এমন ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয় এর কাগজপত্তর নিয়ে যে অন্য কোনও কাজ করার সুযোগ থাকেনা। বিদ্যাসাগর আইন ব্যবসার কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিলে ন।

ছাত্রবান্ধব বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বেই ছাত্রদের জন্যে কি করেছিলেন, তা এবারে বলে নিই। এর আগেই তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বহু বিদ্যালয় খুলেছিলেন, বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন এবং এর পরিচালনায় প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেই মতান্তর হওয়ায় চাকরীও ছেড়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পড়বার মত বই নেই। বিদ্যাসাগর ঠিক

করলেন, ছাত্রপাঠ্য বই লিখবেন একদিন তিনি একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন পালকীতে যেতে যেতে সেই যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হল। লেখা শুরু হল দেশকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার সেই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ স্বরূপ বর্ণপরিচয় লেখা। তারপর অতি দ্রুত তিনি বইটি লেখা শেষ করলেন এবং অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ছোটদের জন্য শিক্ষার সার্থক গোড়া-পত্তনের বই লেখা হল। এই ঘটনাটি যে সেদিনের বড় ঘটনা তা আজকের দিনেও অনুভব করা যায়। বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের পর লেখা হল বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। শুধু এই বর্ণ পরিচয় রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি আর কোনও কাজ নাও কোরতেন তাহলেও তিনি চিরস্মরনীয় হয়ে থাকতেন। এর পর ছাত্রদের জন্য বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বই লিখে ফেললেন। এর আগে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত শেখাবার জন্য কয়েক রাতের মধ্যে যে উপক্রমণিকা লিখেছিলেন এবার তার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন। তাঁর জীবনচরিত, আখ্যান মঞ্জরী, চরিতাবলী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের রচিত মহাভারতের উপক্রমণিকা আগেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন লিখলেন সীতার বনবাস। এই বইটিও অতি আদরের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়ান শুরু হল। তার পর শুরু করলেন "রামের রাজ্যাভিষেক"। কিছুটা ছাপাও হল। এমন সময় শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এসে হাজির হলেন হাতে তাঁর লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি— সেও "রামের রাজ্যাভিষেক"। শশিভূষণের বইটি বিদ্যাসাগর হাতে নিয়ে একটু চমকে উঠে বললেন— একি তুমিও রাজ্যাভিষেক লিখেছ নাকি ? পড়ে দেখলেন মন্দ হয়নি এর পর নিজের লেখা বন্ধ করে দিলেন। লেখার বাকী অংশ পর্যন্তও আর ছাপলেন না।

লেখার কিন্তু বিরাম নেই। নানা কাজের মধ্যেও দ্রুত গতিতে লেখার কাজ চলতে লাগল। বর্ধমানে গিয়ে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং রোগশয্যায় সৃষ্টি হল ভ্রান্তিবিলাস। হাস্যরসের চমৎকার

এই বই পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। বই অনেক লিখছেন কিন্তু অপরের ছাপাখানায় ছাপতে গেলে খরচ অনেক পড়ে। তাই দুই বন্ধু বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মিলে ছুশো টাকায় হাতে চালানো একটি ছাপখানা কিনেছিলেন। নাম রেখেছিলেন সংস্কৃত মুদ্রণযন্ত্র। বই বিক্রি করার জন্য একটি বইয়ের দোকানও খোলা হল। তার নাম সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী। তখন লেখাতে এখনকার মত কমা বা দাঁড়ির প্রচলন ছিল না। একটানা লম্বা লম্বা লাইন চলে যেত। বিদ্যাসাগর প্রথম পড়বার সুবিধা অনুযায়ী, গলার আওয়াজ অনুযায়ী নানান বিরাম চিহ্নের সৃষ্টি করলেন। এর দ্বারাও বাংলা ভাষায় এর আগে ছিল যা জড়তা এখন হল সচল।

বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করে গেছেন। বস্তুত পক্ষে এই সময়ই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক রূপে বিদ্যাসাগর প্রকট হয়েছেন। চাকরী না ছাড়লে হয়ত বাংলা ভাষার এই নব স্রষ্টাকে আমরা তেমন মহিমায় পেতাম কিনা সন্দেহ। তাঁর বাংলা রচনার ধারা প্রবল বেগে বয়ে চললেও তিনি সাহিত্য রচনায় সময় দিলেন না। নিজের অনেক যশ ও খ্যাতির সুযোগ তিনি গ্রহণের চেষ্টা না করে মনোনিবেশ করলেন শিশুদের ও ছাত্রদের উপযোগী পুস্তক রচনায়। তিনি চাইলেন, যারা সমাজের ভবিষ্যৎ সেই শিশুদের, দ্রুত শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তার জন্য সাহিত্য রচনা না করার ত্যাগ স্বীকার বিদ্যাসাগরের কাছে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

বহুমুখী গুণের সাগর বিদ্যাসাগর এবার মন দিলেন সমাজ সংস্কারে। তরুণ বয়সেই তিনি বৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বিধবা বধূর চোখের জল দেখে যে বিচলিত হয়েছিলেন এবং অঝোরে অশ্রুপাত করেছিলেন সেই থেকেই শুরু হয়েছিল বিধবা বালিকাদের সমাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্যাসাগরের সেই দুর্বার আন্দোলন। বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক বাল্য সহচরী ছিল।

ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করতেন। তিনি যখন কলকাতায় চলে আসেন তখন তার বিবাহ হয় এবং বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা রূপে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন ছুটিতে দেশে গিয়েছেন মা ভগবতী দেবীর মুখে শুনলেন যে মেয়েটি আজ কিছু খায়নি। কেন খায়নি? বিদ্যাসাগর জানতে চাইলেন। শুনলেন হিন্দু বিধবাদের একদশীর দিন কিছু খেতে নেই, এমন কি একফোঁটা জল পান করাও নিষিদ্ধ। এ কিরকম নিয়ম! তের চোদ্দ বছরের ঈশ্বরচন্দ্রের মনে সেদিন যে দুঃখের স্মৃতি জেগেছিল তা কোনও দিন মুছে যায়নি।

এখন বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন। তিনি বুঝলেন এই অসংখ্য বাল্য বিধবাদের যদি পুন-র্বিবাহ দেওয়া যায় তবেই এদের সত্যিকারের দুঃখমোচন সম্ভব। কিন্তু অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হিন্দু সমাজ আর সমাজপতি যাঁরা তাঁরা এধরণের কাজকে ঘোর ধর্মবিরোধী মনে করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর থামবার পাত্র নন। তিনি সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করে বার করালেন যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পরাশর সংহিতায় রয়েছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যে বিধীয়তে।

অর্থাৎ স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, মারা যায়, সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে, ক্লীব হয় কিংবা ধর্মত্যাগ করে—এই পাঁচ কারণে নারী অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। অকাট্য যুক্তি পেলেন বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রের বিধান সহযোগে রাত জেগে বিদ্যাসাগর লিখে ফেললেন প্রবন্ধ। পরদিন অক্ষয় কুমার দত্ত আসতেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন রাত জাগা রচনা। বিদ্যাসাগরের লেখা কাজেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্রুত প্রকাশিত হলো আর সৃষ্টি হল সমাজে প্রবল আলোড়ন। হৈচৈ পড়ে গেল শহর কলকাতায়। পণ্ডিত সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, সমাজের এতদিনে সংস্কারের ভিত্ যেন নড়ে উঠল। বিদ্যাসাগর পেয়েছেন শাস্ত্রের বিধান এবার চাই বাবা মায়ের মত ও আশীর্বাদ। বিদ্যাসাগর এলেন

বীরসিংহে। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, মা ভগবতীদেবী খেতে বসেছেন। হঠাৎ কাছেই এক বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। মা খাওয়া বন্ধ করলেন। চমকে উঠে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন মা কি হলো। জননী বললেন—ঐ বাড়ীর বউটির স্বামী পরশু মারা গিয়েছে বাবা। নয় বছরের মেয়ে বিধবা হলো। এদের জন্য কিছু করতে পারিস না বাবা?

বিদ্যাসাগর বললেন—মা আমি বিধবা বিবাহের প্রচলন করব। মা ভগবতীদেবী বললেন, করবি? তাহলে তো খুব ভাল হয় বাবা, আমি এই বালবিধবাদের কষ্ট আর সইতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান যে বড় কঠোর। বিদ্যাসাগর বললেন—আমি শাস্ত্রের বিধান পেয়েছি মা। বিধবা বিবাহে শাস্ত্রে কোনও বাধা নেই, এখন তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি কাজে অগ্রসর হই। ভগবতী দেবী বললেন—আমি অনুমতি দিলাম।

মায়ের অনুমতি তো পাওয়া গেল এবার বাবার কাছে এলেন বিদ্যাসাগর। ঠাকুরদাসের কাছে কথাটি তুলতে ঠাকুরদাস বললেন, কাজটি খুবই ভাল, কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের শাসক সমাজপতিরা এতে বাধা দেবে। বিদ্যাসাগর বললেন—বাধা পাব তা জানি, শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে বিধবাদের দুর্দশার কথা বলে দেশে জনমত স্মৃষ্টি করব। ঠাকুরদাস বললেন—যদি পারিস তো ভাল, আমার কোনও আপত্তি নেই, ভাল কাজে ভগবান তোর সহায় হবেন।

বাবা মার আশীর্বাদ মাথায় করে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরে এলেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। বন্ধুরা অনেকেই উৎসাহ দিলেন কিন্তু বাধা এলো প্রবীন সমাজপতিদের কাছ থেকে। রাজা রাধাকান্তদেব তখন কলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমাজে ও রাজদরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। বিদ্যাসাগর তাই আনন্দকৃষ্ণ বসুকে বললেন—মহারাজ যদি এই বিধবা বিবাহের ব্যাপারে একটু সহায় হন তাহলে খুব ভাল হয়। আনন্দকৃষ্ণের সংকোচ হওয়ায় বিদ্যাসাগর

রাধাকান্তদেবকে একটি পত্র ও তার বিধবা বিবাহের সমর্থনে লিখিত প্রবন্ধের বই পাঠালেন। রাধাকান্ত বিদ্যাসাগরের যুক্তির প্রশংসা করলেও কোনও মতামত প্রকাশ না করে বললেন—যদি তুমি রাজী হও পণ্ডিত, তাহলে একদিন পণ্ডিতদের ডাকি, বিতর্ক হোক বিচার পাওয়া যাবে। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। একদিন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বিচারসভা বসল। পরনে থান ধুতি ও গায়ে চাদর সভার মাঝখানে বসলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিতদের প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে বই বিদ্যাসাগর রচিত "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা"। পণ্ডিতরা তীব্র ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বললেন—হিন্দু সমাজ রসাতলে যাবে। বিদ্যাসাগরও শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পণ্ডিতদের যুক্তি খণ্ডন করলেন। কিন্তু কোনও মীমাংসা হল না। তবে বিদ্যাসাগরের তর্ক পদ্ধতি ও সরস বাক্য প্রয়োগে খুশী হয়ে রাজা রাধাকান্ত তাঁকে একটি শাল উপহার দিলেন। পণ্ডিতরা মনে করলেন রাজা রাধাকান্ত বুঝি বিধবা বিবাহের সমর্থক। তারা পরে এসে তাঁকে বললেন—আপনি একি করলেন এই সর্বনাশা ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেন। রাধাকান্ত বললেন শাস্ত্রের আমি আর কি বুঝি, তবে পণ্ডিতরা চাইলে আর একদিন বিচার সভা হতে পারে।

কিছুদিন পর আবার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বিচার সভা বসল। এবার বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন বাংলার পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। সেদিনও বিতর্কের ঝড় উঠল কিন্তু কোনও মীমাংসা হল না। রাধাকান্ত এদিন ব্রজনাথকে একটি শাল উপহার দিলেন কারণ তাঁকে কেন্দ্র করেই এদিন প্রবল বিরুদ্ধ বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেদিন অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে সভা থেকে চলে এলেন, তবে বিচলিত হলেন না বা লক্ষ্য থেকে সরেও এলেন না। একটা ব্যাপার বরং লক্ষ্য করলেন যে চারিদিকে এই নিয়ে আলোচনা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, লোকের মুখে মুখে এখন বিধবা বিবাহের কথা। বিদ্যাসাগরের লেখা বইটির দুবারে মোট পাঁচ হাজার কপি হু হু করে বিক্রি হয়ে গেল। নিস্তরঙ্গ হিন্দু সমাজে

উঠল বিপ্লবের প্রবল ঢেউ।

কলকাতার শ্যামাচরণ দাস জাতিতে ছিলেন কর্ম্মকার। তিনি তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়ে পণ্ডিতদের বিধান সংগ্রহ করেন, বেশ কয়েকজন নামকরা পণ্ডিত তাঁর মেয়ের পুনর্বিবাহের স্বপক্ষে বিধান দিলেও পরে অজ্ঞাত কারণে তাঁরা বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। শ্যামাচরণ তাঁর লিখিত বিধানের জোরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু তিনিও সমাজের ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর বুঝলেন পণ্ডিতদের সৎসাহসের অভাব। তাঁরা অনেকেই মনে মনে সমর্থন করলেও সাহস করে বলবার বা মত দেবার ক্ষমতা রাখেন না। তিনি বুঝলেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে হবে—দুর্বল সমাজের বুকে শক্তির সঞ্চার করতে হবে। চারিদিকে নানা বাদ প্রতিবাদের মাঝে বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করলেন, শাস্ত্র যুক্তিকে আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করে। এই বইটিও দারুণ কাটতি হল। এখন সমাজপতিরা প্রকাশ্যে বিদ্যাসাগরকে নিন্দা ও অপবাদ দিতে লাগলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, বিদ্যাসাগর সমাজের শত্রু, বিদ্যাসাগর অনাচারী ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। এত বিরোধিতার মাঝে ইংরাজী জানা কিছু মানুষের সমর্থন পেলেন বিদ্যাসাগর ও পাশে পেলেন পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে।

বিদ্যাসাগর দেখলেন চারিদিকে যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তাতে রাজপুরুষদেরও এ ব্যাপারে অবহিত করা উচিত। তিনি তাঁর বইগুলির ইংরাজী অনুবাদ করে তার প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু ও প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী।

অনুবাদ প্রকাশ হলে ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও হিন্দু বিধবাদের অপরিসীম দুঃখ কষ্টের কথা জানতে পারলেন। বিদ্যাসাগর কয়েকজন বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করলে তাঁরা বললেন এ ব্যাপারে তাঁদের সহানুভূতির কোনও অভাব হবে না তবে প্রথমে আইনসিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরও এটা আগেই বুঝেছিলেন

যে শুধু শাস্ত্র সিদ্ধ হলে হবে না আইন সিদ্ধ হলে তবে মানুষের সাহস হবে। তিনি এক হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠানোর মনস্থ করলেন। কিন্তু প্রথমে কেউই মুখে সমর্থন জানিয়েও স্বাক্ষর দিতে চাইলেন না। বিদ্যাসাগর এতে না দমে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। এই সময় তিনি সবচেয়ে ভরসা পেলেন উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি প্রথমে স্বাক্ষর করায় অনেকেই স্বাক্ষর দিতে সম্মত হলেন। হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বিদ্যাসাগর আইনের খসড়া সমেত চিঠি পাঠালেন ব্যবস্থাপক সভায়। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে অনেকেরই চোখ খুলে গেল। বর্ধমানের মহারাজাও একে সমর্থন করে একটি আলাদা আবেদনপত্র পাঠালেন। এর পরে পর পর নবদ্বীপের মহারাজা, ময়মনসিংহের জমিদার, ঢাকার জমিদার এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত ভাবে আলাদা আলাদা আবেদন পত্র পাঠাতে লাগলেন।

বিরুদ্ধবাদীরাও বসে রইলেন না। তারা এমনকি বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশ করবার পরিকল্পনা নিলেন, রাস্তায় মাঝে মাঝেই ঘিরে ধরে নানান রকম ভাবে বিদ্যাসাগরকে হেনস্থা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠাকুরদাসের কানে কথাটা গেলে তিনি ছেলেকে নিরুৎসাহ না করে বললেন—ধরবার আগে ভেবে বুঝে করা উচিৎ ছিল। তবে যখন বুঝে ধরেছ তখন ছেড়ো না। কথায় এবং কাজে যেন মিল থাকে। শ্রীমন্ত ছিলেন গ্রামের বিখ্যাত লাঠিয়াল। ঠাকুর-দাস তাকে বিদ্যাসাগরের বিপদের কথা ভেবে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

একদিন রাত্রিবেলায় বিদ্যাসাগর বাড়ী ফিরেছেন। অন্ধকার জায়গায় কয়েকজন গুণ্ডা তাঁকে ঘিরে ধরল। বিদ্যাসাগর দেখলেন শ্রীমন্ত একটু পিছিয়ে পড়েছে। ডাকদিলেন—শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত পেছন থেকে হাঁক দিল, হাঁ কর্ত্তা, ঠিক আছি, ভয় নেই এগিয়ে চলুন। এই কথা বলে শ্রীমন্ত একদৌড়ে বিদ্যাসাগরের কাছে পোঁছে গেল। লাঠি

হাতে শ্রীমন্তকে দেখে গুণ্ডারা অন্ধকার গলিতে গা ঢাকা দিল।

যিনি এই গুণ্ডাদের লাগিয়ে ছিলেন, পরদিন বিদ্যাসাগর খোঁজ নিয়ে সটান ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় হাজির হলেন এবং দেখলেন তিনি ওই গুণ্ডাদের মাঝখানে বসেই আলোচনা করছেন। বিদ্যাসাগর বললেন—আমাকে মেরে ফেলবার জন্য এত কষ্ট করছেন কেন? তাই আপনার কাছে এলাম। কাজটা সেরে ফেলে মৃতদেহটা ফেলে দিন কোনও জায়গায়, কেউ জানতে পারবে না। বিদ্যাসাগরের কথা শুনে লজ্জায় সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কোন কথাই সেই ভদ্রলোক বলতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে চতুর্দিকে আলোড়ন আরও বৃদ্ধি পেল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা লিখলেন, শান্তিপুরের তাঁতিরাও শাড়ীর পাড়ে লিখতে লাগলেন,

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে আপিল বিধবাদের হবে বিয়ে"।

বাংলা দেশে যেন এক নতুন যুগের সৃষ্টি হল। উমেশচন্দ্র মিত্র লিখলেন বিধবা বিবাহ নাটক। প্রথমে সিঁদুর পটির গোপাল মল্লিকের বাড়ী তার পর পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে সেই নাটকের অভিনয় হল। এই অভিনয়ের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তরুণ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের একজন উৎসাহী অনুগামী ও সমর্থক। বিধবা বিবাহ নাটকে যারা অভিনয় করলেন তারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। বিদ্যাসাগর কয়েকবার সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকবার তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের আবেদন নিষ্ফল হল না। কিছুদিন পরেই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য জে, পি, গ্রাণ্ট বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া সভায় উত্থাপন করেন এবং সমর্থন করেন অপর সদস্য স্যার জেমস কলভিন। বিরুদ্ধবাদীরাও বসে নেই। তারাও রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দু ধর্ম রক্ষার ধূয়া তুলে শেষ বারের মত চেষ্টা করলেন যাতে আইন পাশ না হয়। কিন্তু সত্যের কণ্ঠ রোধ

সম্ভব হল না। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ আইন পাস হল। বিরোধীরা জব্দ হল, জয় হল বিদ্যাসাগরের। চারিদিকে বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় সবাই মুখর হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগর তখনও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে রয়েছেন, বয়স মাত্র ছত্রিশ।

আইন পাশ হলেই হবে না, বাস্তবে বিধবা বিবাহ চালু হওয়া তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। বিধবা বিবাহের উদ্যোগ চলতে লাগল। মদন মোহন তর্কালঙ্কারের চেষ্টায় পাত্র পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। পাত্র যশোরের প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী নদীয়া জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালিমতি দেবী। ব্রহ্মানন্দ তখন জীবিত নেই, তাঁর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীমণি দেবীর সাহস দেখে সবাই ধন্য ধন্য করলেন। গ্রামের বাড়ীতে বিয়ে হওয়া অসুবিধা তাই ঠিক হল কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে বিয়ে হবে। পাত্রী ও তার মাকে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে এনে তোলা হল। নিমন্ত্রন পত্র বিলি করা হল বহু বিশিষ্ট মানুষকে। বিদ্যাসাগর নিজে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রন জানালেন। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল। বহু অনিমন্ত্রিতও কৌতুহল বশত ভিড় করে বরের পাল্কিতে আগমণ প্রত্যক্ষ করলেন। যাতে বিরুদ্ধবাদীরা হাঙ্গামা করতে না পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর পুলিশের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। পালকির সঙ্গে এলেন রাম গোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বিশিষ্ট মানুষেরা। বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হল। উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমনি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পাইক পাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি। কন্যার মাতা লক্ষ্মীমনি দেবী কন্যা সম্প্রদান করলেন। মহা-সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হলো। সমস্ত খরচ বহন করলেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। বিদ্যাসাগরের আজ বহু প্রচেষ্টার, বহুদিনের স্বপ্ন সফল হল।

কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে কথা দিয়েও এলেন না। এঁদের মধ্যে রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ অন্যতম। অক্ষয় কুমার দত্তও আসতে পারেন নি অসুস্থ থাকায়।

এর পর আরও বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হতে লাগল। যুবকদের মনে এই ব্যাপারে উৎসাহের সঞ্চার হল। বিদ্যাসাগর প্রায় প্রত্যেকটি বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এবং আর্থিক ব্যয় বহন করে খুব ভাল ভাবে বিধবা বিয়ে গুলি সম্পন্ন করতে লাগলেন। শুধু তাই নয় নব দম্পতি যাতে সুখে জীবন ধারণ করতে পারে সেই দিকেও তিনি দৃষ্টি রাখতেন। এর ফলে তাঁর বিপুল অর্থ ব্যয় হতে লাগল। বহু টাকা ঋণও হয়ে গেল। প্রথমে অনেক অর্থশালী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু পরে তাদের উৎসাহ কমে গেল, সব আর্থিক চাপ বিদ্যাসাগরকেই বহন করতে হতে লাগল। তখন বিয়ে অল্প খরচে হলে লোকে যাতে না বলতে পারে যে কোন মতে বিয়ে হল, তাই বিদ্যাসাগর বিয়ের জাঁক-জমকের কোন ত্রুটি রাখতেন না। কোন কোনও বিয়েতে তখনকার দিনেও দশহাজার টাকা পর্যন্ত খরচ তাঁকে করতে হয়েছিল, অথচ তাঁর নিজের পরনে সেই মোটা ধুতি ও গায়ে চাদর আর পায়ে তালতলার চটি। এক বিন্দু বাহুল্যের ছোঁয়াও তাতে নেই। বিদ্যাসাগরকে এই উদ্যোগে আর যাঁরা খুব সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব যাঁকে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের কারণে গ্রামের লোক একঘরে করেছিল, প্রভৃতি মানুষ ছিলেন। অক্লান্ত চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসাগর প্রায় একশতটি বিধবা বিবাহ দিলেন এবং এ ব্যাপারে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে।

দেশে হঠাৎ সিপাহী বিদ্রোহের আগুন এই সময় জ্বলে উঠল। ফলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন অল্প কিছুদিনের জন্য একটু থমকে রইল। একবছর পর দেশ একটু শান্ত হলে, আবার বিধবা বিবাহ শুরু হল।

কিন্তু এই সময় আর একদিক দিয়ে হল বিপর্যয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের

পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে দিলেন। তাঁর কাছে আত্মমর্যাদা বোধই বড়, চাকরী নয়।

তিনি বহুদিন থেকে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশের কথা চিন্তা করেছিলেন কারণ সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই জনমানসে কুসংস্কারের প্রভাব কমান কিছুটা সম্ভব হয়। সংস্কৃত কলেজে অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু বধির ছাত্র সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় উপযুক্ত কর্মসংস্থান না হওয়ায় বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলে তিনি বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। সোমবার বেরোবে তাই 'সোমপ্রকাশ' নাম হল কাগজের, আর সারদাপ্রসাদকে দায়িত্ব দিলেন কাগজ চালানোর। পরে সারদাপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের সুপারিশে বর্ধমান মহারাজার বাড়ীতে মহাভারত অনুবাদের কাজ পেয়ে চলে গেল। বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অক্লান্ত চেষ্টায় 'সোমপ্রকাশ' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে অবশ্য নানা কারণে সোমপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

অসাধারণ মানুষ "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন অকালে মারা গেলেন। তাঁর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিরোধে অগ্নিময়ী লেখার কথা দেশের মানুষ কখনও ভুলতে পারবে না। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিদ্যালয়ে না পড়েও যে ব্যক্তি উন্নতির শীর্ষে উঠে ছিলেন, তাঁর মৃত্যু দেশের পক্ষে অপূরনীয় ক্ষতি। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট বন্ধ হয়ে গেল।

হরিশচন্দ্রের পরিবার হয়ে পড়ল নিঃসহায়। এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহকে অনুরোধ করলেন—তুমি প্রেস ও কাগজটা কিনে নাও, তাহলে দেশের গৌরব ও একটি অসহায় পরিবার রক্ষা পাবে। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী ছিলেন এবং নিজেও অত্যন্ত দানশীল ও উদার হৃদয় মানুষ ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পাঁচ হাজার টাকায় কাগজটি ও প্রেস কিনে একটি অসহায় পরিবারের অস্তিত্বকে এবং

একটি দেশ-হিতৈষী পত্রিকাকে রক্ষা করলেন। কিছুদিন পত্রিকাটি সম্পাদনার ভারও নিলেন বিদ্যাসাগর।

মাইকেল মধুসূদন তখন বিলেত গিয়েছেন ব্যারিস্টারি পড়তে। বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার করে খরচ সংগ্রহ করতে হয়ে ছিল। কথা ছিল বন্ধু বান্ধবরা তাঁকে নিয়মিত টাকা পাঠাবেন। যাঁর ওপর জমিদারী দেখবার ভার দেওয়া ছিল, কথা ছিল, তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাবেন, তিনি তাঁর কথা রাখলেন না। বন্ধু বান্ধবরাও তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন। মধুসূদন বিদেশে পড়লেন চরম সংকটে। যে হোটেলে তিনি উঠেছিলেন তাদের বহু টাকার বিল বাকী পড়ায় খাওয়া দাওয়া তো বন্ধ হয়েছেই এমন কি জেলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী পুত্র। নানা চিন্তা ভাবনার মধ্যে মধুসূদন স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁকে খুব করুণ পত্র লিখে জানালেন তাঁর অবস্থার কথা। বিদ্যাসাগর এই পত্র পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু মুশকিল তাঁর নিজেরও তখন দারুণ অর্থাভাব চলছে। তিনি চিঠিটি মধুসূদনের বন্ধু বান্ধবদের দেখালেন। তারা তেমন গা করল না। বিদ্যাসাগর তো করুণার ও সিন্ধু, তাই তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। পরের ডাকেই দেড় হাজার টাকা ধার করে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে আদালতের লোক এসে বসে আছে মধুসূদনকে জেলে নিয়ে যাবার জন্য। মধুসূদন তাদের আর একটু অপেক্ষা করতে বলে বললেন—ভারতবর্ষ থেকে ডাক আসা অবধি আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি যার কাছে চিঠি লিখেছি তিনি নিশ্চয় চিঠি পেয়েই টাকা পাঠাবেন। একটু পরেই ডাকে এসে পৌছল করুণা সাগরের পাঠান টাকা। এক চরম সংকট থেকে রক্ষা পেলেন মধুসূদন।

মানুষের বিপদে বিদ্যাসাগরের হৃদয় সর্বদাই ব্যাকুল। একবার এক জাহাজ ডুবিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। বিচলিত বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করে বললেন—এই দুনিয়ার যিনি মালিক, আমাদের চেয়েও কি তিনি নিষ্ঠুর ?- নানা দেশের এতগুলি লোককে একত্র করে এক সঙ্গে

জলে ডুবিয়ে মারলেন। আমি যা পারি না, পরম করুণাময় হয়ে কেমন করে তিনি তা পারলেন? এসব দেখলে দুনিয়ার মালিক কেউ আছেন বলে মনে হয় না।

বহু মানুষ যারা পরবর্ত্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এক সময় তারা বিদ্যাসাগরের করুণায় অভিষিক্ত না হলে তা হতে পারত না। ১৮৭৮ সাল, কুমারখালি বিদ্যালয় থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে দশ টাকা বৃত্তি পেল একটি ছাত্র, নাম তার জলধর সেন। খুব ইচ্ছা আরও লেখাপড়া করবে, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি একদমই নেই। নাম শুনেছিল করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের। তাই একদিন ভয়ে ভয়ে এলো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে, জানাল তার মনের ইচ্ছার কথা। বিদ্যাসাগর তার নাম ধাম জেনে নিলেন কিন্তু পরে জানলেন যে তাঁর কলেজে সিট নেই। তখন তিনি ছেলেটিকে বললেন—তুই এ বছরটা জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশোনা কর। শুনেছি ওখানে জায়গা রয়েছে। পরের বছর তোকে আমার কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিয়ে নেব। জলধর তাও চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিদ্যাসাগর বল্লেন—বুঝেছিরে বুঝেছি, কলেজে ভর্ত্তির আর মাইনের টাকা আমিই দেব, যা যা আর দেরি করিসনি। শীগগির ভর্ত্তি হয়ে যা। ছেলেটি বিদ্যাসাগরের সাহায্যে কলেজে ভর্ত্তি হল। পরবর্তী যুগে এই জলধর সেন বিখ্যাত সাহিত্যিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

আর একজন ছাত্র তার নাম নবীন চন্দ্র সেন। ১৮৬৫ সালে এফ, এ পাশ করেছে। বাড়ী থেকে কোনও সাহায্য পায় না। টিউশনি করে যা পায় তাই দিয়ে কোনও মতে পড়ার এবং খাওয়া দাওয়ার খরচ চালায়, আর তাতে লেখাপড়া ভালভাবে হয় না। খুবই কষ্টে দিন চলে তার। একদিন সে সাহস করে বিদ্যাসাগর মশায়কে তার কষ্টের কথা জানাল। বিদ্যাসাগর তার কথা শুনে একটি কাগজে কি যেন লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, এই কাগজটা আমার কলেজের কেরাণীবাবুর হাতে দিস, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ছেলেটি তাই

করলো। কাগজটি পেয়েই কলেজের কেরাণীবাবু বেশ কিছু টাকা নবীনের হাতে তুলে দিলেন। এ সাহায্য পেয়ে নবীনের মন বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। পরবর্ত্তী জীবনে ইনি বিখ্যাত কবি নবীন চন্দ্র সেনে পরিণত হয়েছিলেন এবং কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বলতেন "নর নারায়ণ"।

অনাবৃষ্টির জন্য ১৮৬৭ সালে বাংলা দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে এক করুণ দৃশ্য। এক মুঠো অন্ন বা এক বাটি ফ্যানের জন্য তখন চরম হাহাকার চলছে। দেশের এই দুর্দিনে বিদ্যাসাগরের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব। তিনি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি অন্নসত্র খুললেন। বীরসিংহ গ্রামেও একটি অন্নসত্র খোলা হল। এই অন্নসত্রে রোজ দেড়শো থেকে দুশো লোক আহার করে বেঁচে ছিল। বিদ্যাসাগর এর সমস্ত আর্থিক ভার নিজে বহন করেছিলেন এবং এই ভাবে টানা চার পাঁচ মাস চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর একবার বর্ধমান শহরে এসেছেন কোনও কাজে। একটি ছোট ছেলে এসে তাঁর কাছে—একটি পয়সা চাইল। বিদ্যাসাগর বললেন, কি করবি? ছেলেটি বলল, খাবার কিনে খাব। বিদ্যাসাগর বললেন, যদি তোকে দুটি পয়সা দিই? তাহলে কালকে আর এক পয়সার খাবার খাব। যদি চারটে পয়সা দিই? তাহলে আম কিনে নিয়ে গিয়ে হাটে বেচবো। তাতে যে লাভ হবে সেই পয়সায় খাব। আবার ওই বেচা কেনা করব। বিদ্যাসাগর ছেলেটির বুদ্ধি ও উদ্যোগী চিন্তায় খুব খুশী হলেন, এবং তাকে আটটি পয়সা দিলেন। পনের দিন পর বিদ্যাসাগর ওই পথে যখন ফিরছেন তখন ছেলেটি আবার বিদ্যাসাগরের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, এই দেখুন বাবু আমি ওই আটটি পয়সা দিয়ে এই একটি টাকা সঞ্চয় করেছি। বিদ্যাসাগর খুব খুশী হয়ে তাকে আদর করলেন ও তার হাতে দশটি টাকা তুলে দিয়ে বললেন, যা দোকান কর। কয়েক বছর বাদে বিদ্যাসাগরকে হঠাৎ একটি

ছেলে এসে প্রণাম করল ওই বর্ধমানেই, পরিচয় দিতে বিদ্যাসাগর চিনলেন এ সেই ছেলেটি। এখন তার দোকান সবচেয়ে বড় এলাকার মধ্যে। বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন।

বিদ্যাসাগরের নিজের বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ, তাই গাঁয়ের সাধারণ মানুষের মতই তাঁর পোষাক। মনে হত না যে তিনি মস্ত বড় চাকরী করেন বা দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত। বহুকাজ বিদ্যাসাগর নিজের হাতেই করতেন। কোনও কাজকেই হেয় বলে মনে করতেন না। একদিন তিনি বাড়ির বাগানে ঘাস নিড়োচ্ছিলেন, এমন সময় চারজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বিদ্যাসাগরকে বাড়ীর মালী মনে করে বলে, ওহে, বিদ্যাসাগর মশাই বাড়ী আছেন ? বল মেদিনীপুর থেকে আমরা এসেছি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে। বিদ্যাসাগর তাদের ভেতরে বসতে বলে বললেন, এক্ষুনি খবর দিচ্ছেন। একটু পরেই হাত পা ধুয়ে বিদ্যাসাগরই এসে উপস্থিত। ভদ্রলোকরা বললেন—কৈ খবর দিয়েছ ? বিদ্যাসাগর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে তাঁরা বললেন, কোথায় তিনি ? বিদ্যাসাগর বললেন কেন এই তো আপনাদের সামনেই রয়েছি। আমার নাম ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোকরা বিস্মিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ে ধূলো নিলো।

আর একবার বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার এক জায়গায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় হল। তখন তিনি সারা দেশে জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলো। হঠাৎ রব উঠল বিদ্যাসাগর এসেছেন, বিদ্যাসাগর এসেছেন। এক বৃদ্ধা ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, কৈ গো বিদ্যাসাগর কৈ ? যাকে প্রশ্ন করল সে দেখিয়ে বলল, ওই তো সামনে দিয়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বলল— হা আমার পোড়া কপাল, না আছে গাড়ী, না আছে চেন দেওয়া ঘড়ি, না চোগা চাপকান, এতো উড়ে বেয়ারার মত চেহারা। একে দেখবার জন্য এত কষ্ট করে হেঁটে এলাম। বলে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

আর একবার এলাহাবাদ ষ্টেশানে এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে ছোট একটি বাক্স হাতে কুলী কুলী করে ডাকছেন। তনখ সেখানে কুলী ছিলো না। বিদ্যাসাগর তখন এলাহাবাদে গিয়েছিলেন এবং ষ্টেশনে এসেছিলেন কোন কারণে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বাক্সটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন চলুন বাবু কোথায় যাবেন। লোকটি অল্প দূরে একটি বাড়ীতে পৌঁছোলে বিদ্যাসাগর বাক্সটি পৌঁছে দিয়ে পয়সা দেওয়ার আগেই হাঁটা দিলেন। পরের দিন একটি সভায় বিদ্যাসাগরের দেখা পরিচিত কিছু মানুষের সঙ্গে। তারা, তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধূলো নিলে সেখানে উপস্থিত সেই ট্রেনযাত্রী লোকটি আশ্চর্য হয়ে গেল এবং একটু পরেই তাদের কাছে যখন জানতে পারল যে ইনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর তখন তাঁর আর লজ্জার শেষ রইল না। ছুটে গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল।

অতি সাধারণ পোষাক পরলেও অপরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন বিদ্যাসাগর। তিনি তাঁর ক্যাশ বাক্স নিয়ে রোজই তাঁর বৈঠকখানায় বসতেন। কত মানুষ সাহায্যের জন্য আসতো, তাদের যথাসাধ্য ও যথাযোগ্য সাহায্য করতেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনের আর এক অতুলনীয় কীর্তি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এই বিদ্যালয় একটি তার এই উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির গুণে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে এফ, এ, ক্লাশ খোলা হল ১৮৭৪ সালে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম এফ, এ, পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত খুসী হয়ে প্রিয় ছাত্রকে নিজে হাতে নাম লিখে স্কটের গ্রন্থাবলী উপহার দেন। দিনে দিনে মেট্রোপলিটান ইন্সিটিউশনের সুনাম বাড়তে লাগল এবং ছাত্রও বাড়তে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরবর্ত্তী কালে রাষ্ট্রগুরু রূপে পরিচিত হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁকেও এই কলেজে দুশো টাকা বেতন দিয়ে নিয়োগ করেছিলেন যখন সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিসের কাজ

থেকে বরখাস্ত হয়ে খুব কষ্টে পড়েছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলতেন—বিদ্যাসাগর আমার কাছে একটি নাম নয়, একটি মন্ত্র স্বরূপ।

বিদ্যাসাগরের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি হলো হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড স্থাপন। মধ্যবিত্ত হিন্দু বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর কি প্রচণ্ড আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েন বিদ্যাসাগর তা লক্ষ্য করেছিলেন। কোন সঞ্চয় ছাড়াই যাদের দিন চলে তারা মৃত্যুর পর স্ত্রীপুত্র কন্যাদের জন্য যে কিছু রেখে যেতে পারবেন না এতো খুবই বাস্তব সত্য। বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন প্রতি মাসে ফাণ্ডে দুটাকা চার আনা করে জমা দিলে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী মাসে পাঁচটাকা করে পাবে। এই গুনিতক অনুসারে যে বেশী জমা দেবে তার পরিবার বেশী পাবে। এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, রায়বাহাদুর শ্যামা-চরণ দে, পাইক পাড়ার কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কাশিম বাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী ও পুঁটিয়ারীর রাণী শরৎকুমারী প্রভৃতি আরও অনেকে এই ফাণ্ডে টাকা অনুদান হিসাবে দিয়ে। ওই উনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারময় যুগেও বিদ্যাসাগর এই আধুনিক চিন্তার প্রয়োগ করেছিলেন দেখে তাঁর কালোত্তীর্ণ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই আধুনিক চিন্তার মানুষ বিদ্যাসাগর বেশভূষায় যতই সাধারণ হোন না কেন বইএর ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট বিলাসী। তাঁর বইগুলি এখনও দেখলে বোঝা যায় যে তিনি বহু খরচ করে বিদেশ থেকে বই চামড়ায় বাঁধিয়ে আনতেন কেন? আজও তাই আমরা বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত বইগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাই।

দেশের বাড়ীতে যা যা জিনিস প্রযোজন হত বিদ্যাসাগর তা কলকাতা থেকে কিনে পাঠিয়ে দিতেন। একবার তেমন প্রয়োজন মত ছয়টি লেপ বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন। জননী ভগবতীদেবী সেই থেকে একখানা লেপ নিজের জন্য রেখে বাকীগুলি বাড়ীর অন্য লোকদের দিয়েদিলেন। বিদ্যাসাগর সেবার শীতকালে বীরসিংহে এসে বাড়ী পৌঁছে মাকে ঘরের মধ্যে দেখতে না পেয়ে, দেখেন মা রান্নাঘরে উনানের

তাতে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন—বড় শীত পড়েছে বাবা, তাই উনানের কাছে একটু বসে আছি। রাতে যতক্ষণ পারি এই খানে বসে থাকি। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন সে কি মা তোমার লেপ নেই ? মা বললেন—ছিল, সেদিন একটি বউ তার ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। তার কষ্ট দেখে আমি লেপটি দিয়ে দিয়েছি। শুনে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, বেশ করেছ মা। এখন বল কটা লেপ হলে তোমার গায়ে একটা লেপ জুটবে। কলকাতা যাবার আগে ভগবতী দেবী কখানা লেপ দরকার ছেলেকে বলে দিলেন। বিদ্যাসাগর মা যা চেয়েছিলেন তার চেয়েও একটি বেশী লেপ পাঠালেন এবং চিঠিতে লিখলেন—মা তুমি যতগুলি চেয়েছিলে তার চেয়ে একটি বেশী পাঠালাম, আশাকরি এবার একটি তোমার কপালে জুটবে। করুণাময়ী মায়ের করুণাময় পুত্র।

ইনকামট্যাক্সের বড় অফিসার হ্যারিসন সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল। তিনি মেদিনীপুর এসেছেন শুনে বিদ্যাসাগর মাকে বললেন—মা আমার এক বন্ধু সাহেব মেদিনীপুরে এসেছেন, ইনি খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন। মা ভগবতী দেবী শুনে বললেন তবে তাঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে আয়, ছেলেটিকে আমি দেখব। সাহেব নিমন্ত্রণ শুনে বললেন, আমি যেতে পারি যদি তোমার মা নিজে হাতে আমাকে আমন্ত্রন করেন। তখন ভগবতী দেবী নিজে হাতে সাহেবকে চিঠি লিখে পাঠালেন। চিঠি পেয়ে সাহেব খুব খুসী, একদিন এলেন বিদ্যাসাগরের বীরসিংহের বাড়িতে। ভগবতী দেবী অনেক রকম রান্না করে রেখেছিলেন, তাই খেতে দিলেন সাহেবকে এবং পাশে বসে বলে দিলেন কোনটির পর কোনটি খেতে হবে। পরিতৃপ্ত হ্যারিসন সাহেব বললেন, পণ্ডিত আপনাদের সাহিত্য ও আপনার মায়ের আদর যত্নে আমি মুগ্ধ হয়েছি, একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ভগবতী দেবীকে সাহেব বললেন—মা শুনেছি আপনার অনেক টাকা আছে, কতটাকা আছে বলুন তো ? ভগবতী দেবী বললেন, হ্যাঁ আমার চার ঘড়া ধন আছে। সামনে বসা বিদ্যাসাগর একটু বিব্রত

হয়ে মাকে বললেন—মা তুমি কার কাছে কি বলছ, ইনি ইনকাম ট্যাক্সের সাহেব, টাকার ওপর কর ধরেন। ভগবতী দেবী বললেন কেন আমি তো ঠিকই বলেছি। হ্যারিসন জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন—কোথায় আছে চার ঘড়া? তখন ভগবতী দেবী দেখিয়ে দিলেন তাঁর উপস্থিত তিন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র এবং হ্যারিসন সাহেবকে। জবাব শুনে সবাই স্তম্ভিত। সাহেব মুগ্ধ হয়ে বললেন এমন মা না হলে কারও এমন ছেলে হয়? সত্যই সেই যুগে এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে এমন প্রগতিশীল মহিলার কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

বীরসিংহের বাড়ীতে একদিন ঠাকুরদাস স্বপ্ন দেখলেন তাঁদের বাড়ী পুড়ে গেছে, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক রকম বিপদ হয়েছে, ভাই বন্ধুদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, বিচ্ছেদ ঘটছে। স্বপ্ন দেখার পর ঠাকুরদাস খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং সব ছেড়ে কাশীতে বাস করবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর বাবাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের মত পরিবর্ত্তন না হওয়ায় শুভদিন দেখে বাবা মাকে নিয়ে কাশী যাত্রা করলেন। কাশীতে বিদ্যাসাগর এসেছেন। তাঁর দানের কথা তখন দেশজোড়া, তাই পাণ্ডারা এসেছে উপস্থিত বিদ্যাসাগরকে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করাতে নিয়ে যেতে। আশা, ভাল দর্শনী আদায় হবে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর দর্শনে যেতে চাইলেন না। পাণ্ডারা বলল—তাহলে আপনি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মানেন না? বিদ্যাসাগর বাবা ও মায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—এঁরাই আমার বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা।
কাশীতে বাবার একটা থাকার ব্যবস্থা করেদিয়ে বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু পিতাকে ছেড়ে এসে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

নানা কারণে বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন তেমন সুখের ছিল না। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে হরচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র ছোট বয়সেই মারা যান। বিদ্যাসাগর তাদের খুব ভাল বেসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের প্রায় ষোল বছর পরে তাঁর

পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের জন্ম হয়। তার পর চার কন্যা হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী জন্মান। স্ত্রী দীনময়ী পুত্র কন্যাদের নিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই দেশের বাড়ীতে থাকতেন, শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিকতায় তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে বহুদূরে ছিলেন। দাম্পত্য জীবন তাঁদের সুখের হতে পারে নি। বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন বহুলোক এক সঙ্গে থাকলে সংসারে অশান্তি হতে পারে তাই তিনি ভায়েদের আলাদা আলাদা বাড়ী করে দিয়েছিলেন এবং খরচ চালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সংসারে শান্তি বজায় থাকেনি। একদিন ঠাকুর দাসের দেখা স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বীরসিংহের বাড়ীখানি পুড়ে শেষ হয়ে গেল। কলকাতায় খবর পৌঁছলে বিদ্যাসাগর বীরসিংহ পৌঁছলেন এবং মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ভগবতী দেবী গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইলেন না। কোনও রকমে আবার একটি কাঁচা বাড়ীই তোলা হল। তখনও বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থাকেন, বাদুড় বাগানে নিজের বাড়ী করেননি।

এর পর একদিন গ্রামের একটি বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে ভায়েদের সঙ্গে তাঁর চরম মনোমালিন্য হল। ফলে পরদিন অভুক্ত বিদ্যাসাগর চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। যে ভাইদের জন্য বিদ্যাসাগর এত করেছেন, তাদের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর ভাল ব্যবহার পাননি। মেজ ভাই দীনবন্ধু প্রেসের ও বইয়ের দোকানের অংশ দাবী করলেন ও মামলা করতে চাইলেন। শেষ অবধি ব্যাপারটা সালিসিতে গেলে দীনবন্ধুর দাবী টিকল না তবে ভাইয়ে-ভাইয়ে মুখ দেখা-দেখি রইল না। এই অবস্থাতেও বিদ্যাসাগর তাদের অবস্থা বিবেচনা করে ভাইয়ের বউকে গোপনে গোপনে সংসার চালাবার টাকা দিলেন এবং বললেন—আমি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, যা হোক কোনও রকমে এই টাকায় চালিয়ে নাও। দীনবন্ধুর কষ্টের মাত্রা বাড়তে থাকলে বাধ্য হয়ে আবার সেই দাদারই শরণাপন্ন হলেন। তখন বিদ্যাসাগর কিছুদিন চেষ্টা করে ছোটলাটকে বলে দীনবন্ধুকে ডেপুটি-

ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী যোগাড় করে দিলেন।

কিছুদিন পর খবর এলো কাশীতে ঠাকুরদাস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে কাশীতে এলেন, এবং চিকিৎসা ও সেবা যত্নে অল্প দিনেই ঠাকুরদাসকে সুস্থ করে তুললেন। বিদ্যাসাগর ও ভগবতীদেবী বহু অনুরোধ করা সত্বেও ঠাকুরদাস দেশে ফিরতে রাজী হলেন না, তখন বাধ্য হয়ে মাকে বাবার কাছে রেখে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র এই সময় কাশীতে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ভগবতীদেবী তীর্থ দর্শন করে পরে ফিরে এলেন কলকাতায়।

কিছুদিন পর ঠাকুরদাস কাশীতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবারও মাকে নিয়ে বিদ্যাসাগর কাশীতে এলেন এবং সেবা যত্নে বাবাকে সুস্থ করে তুললেন। এবার মাকে বাবার কাছে রেখে এলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনের এক চরম শোকাঘাত এলো এর দু'মাস পর। ইংরাজী ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে, বাংলার চৈত্র সংক্রান্তির দিন রত্নগর্ভা মহৎহৃদয় বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী তাঁকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেলেন। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। পুরো এক বছর হবিষ্যি করে, পায়ে জুতো মাথায় ছাতা না দিয়ে, এক বেলা খেয়ে মায়ের ওপর শ্রদ্ধা জানালেন।

এর কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগর পেলেন আর এক শোকের আঘাত। বড় জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতি মারা গেলেন। বিদ্যাসাগরের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বড় মেয়ে হেমলতার বিধবা বেশ তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। পরে মেয়েদের পুনঃপুনঃ অনুরোধে পুনরায় মাছ খেতে রাজী হয়েছিলেন।

এর চার বছর পর কাশীতে ঠাকুরদাসও দেহ রাখলেন। এই সময় বিদ্যাসাগর ও তাঁর ভায়েরা কাশীতেই ছিলেন। অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হবার পর কলকাতায় ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। পিতা মাতা দুজনেই চলে গেলেন—তাঁর শক্তিও যেন কমে গেছে মনে হতে লাগল

বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনে এক ইংরাজ বিদুষী মহিলা মেরী কার্পেন্টারের খুব সহযোগিতা পেয়েছিলেন নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বেথুন বিদ্যালয়ের পরিচালনার সময় মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। একদিন মেরী কার্পেন্টার উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাবেন এবং চাইলেন বিদ্যাসাগরও তাঁর সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যান। ঘোড়ার গাড়ীতে বিদ্যাসাগর যাওয়ার পথে হঠাৎ গাড়ীটা উল্টে যাওয়ায় গাড়ী থেকে ছিটকে পড়ে যান এবং অজ্ঞান হয়ে যান। পিছনে পিছনে আসছিল মেরীকার্পেন্টারের গাড়ী। তিনি তাড়াতাড়ি আহত বিদ্যাসাগরকে তুলে নিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বাতাস করেন। এই আঘাত এতই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল যে বিদ্যাসাগর আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁর আগেকার স্বাস্থ্য আর ফিরে এলো না। শেষ জীবনেও তাঁকে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে ঠিক হল কোন স্বাস্থ্যকর যায়গায় গিয়ে কিছুদিন বাস করার। প্রথমে দেওঘরে যাবেন বলে বাড়ী দেখাও হল, কিন্তু বেশী দাম বলে কেনা গেল না। শেষে সাঁওতাল পরগনায় কার্মাটারে একটি ছোট বাড়ী তৈরী করালেন। বনজঙ্গলের মধ্যে নিভৃত পরিবেশে বিদ্যাসাগর প্রায় একাকী দিনযাপন করতেন তখন। দিনগুলি এই সাঁওতাল মানুষদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই কেটে যেতো তাঁর। এখানে এসে বিদ্যাসাগর তাঁর আর্ত সেবার বিরাম দেননি, বরং এক নতুন ভাবে তিনি তাঁর বরাভয় হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে অনেক ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই আনিয়েছিলেন এবং এই চিকিৎসা সম্পর্কে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি এই অশিক্ষিত স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দারুণ ভাবে করতে লাগলেন। একদিনের কথা, হঠাৎ অনেক রাতে বিদ্যাসাগর কার্মাটারের বাড়ীর দরজায় করাঘাত হল। বিদ্যাসাগরের ঘুম ভেঙে গেল। বিশ্বস্ত ভৃত্য অভিরাম লাঠিটা হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই দেখেন এক মেথর রমনী এসেছে

বিদ্যাসাগরের কাছে, তার স্বামী কলেরায় প্রায় মৃত্যু শয্যায়। অভিরাম প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল—যা যা কাল সকালে আসিস, এখন বাবুকে ডাকতে পারব না। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। এদিকে এই কথা বার্তার মাঝে কখন ওষুধের বাক্স হাতে বিদ্যাসাগর বাইরে এসে গেছেন অভিরাম খেয়াল করেনি। তিনি মেয়েটিকে বললেন, চল আমাকে নিয়ে। বাধ্য হয়ে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে অভিরামকেও সঙ্গে যেতে হল। সারারাত রোগীর পাশে বসে থেকে এবং চিকিৎসা করে, রোগীকে মোটামুটি সুস্থ করে তবে ফিরলেন বিদ্যাসাগর। ওখানকার মানুষজন বিদ্যাসাগরকে বলত দেবতা। সত্যই তারা তাদের মাঝে ভগবানকে পেয়েছিল। এখন কার্মাটার ষ্টেশনের নাম পরিবর্ত্তন করে "বিদ্যাসাগর" রাখা হয়েছে।

কলকাতার বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর তৈরী করালেন নিজের বাড়ী। তাঁর বহু স্থান থেকে সংগৃহীত নানা বিষয়ের ওপর বহু বই দিয়ে সাজালেন তাঁর লাইব্রেরীটি। এই বাড়ীতেই তাঁর কাছে এসেছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, কেশব সেন প্রভৃতি অনেক দেশ বিখ্যাত মানুষ। একদিন এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি একদিন বললেন যে, আমি বিদ্যাসাগরকে দেখতে যাব। সেই মত ব্যবস্থা হল। ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে রামকৃষ্ণও এলেন বিদ্যাসাগর দর্শনে, সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পরমহংসদেব এলে বিদ্যাসাগর তাঁকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন এবং বসালেন। তার পর শুরু হল কথোপকথন। রামকৃষ্ণদেব বললেন —খানা-ডোবা-খাল-বিল পার হয়ে এবার সাগরে এসে পড়লাম। বিদ্যাসাগর শুনে বললেন এসেই যখন পড়েছেন তখন তো আর উপায় নেই দুঘটি নোনা জল নিয়ে যান। রামকৃষ্ণদেব বললেন—নোনাজল কেন হবে গো,— তুমিতো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। এসাগরে শুধু রত্নই আছে, এসেছি যখন রত্ন নিয়ে যাব। রামকৃষ্ণদেব বলে চলেছেন, বিদ্যাসাগর শুনছেন। বললেন—বিদ্যাসাগর, তোমার কর্ম্মতো সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বগুণ আসে দয়া থেকে, তোমার দয়া নিষ্কাম দয়া। যারা নামের জন্য দয়া দেখায়, তাদের দয়া নিষ্কাম নয়।

তোমার দয়ায় কামনা নেই। তুমিতো সিদ্ধ পুরুষ। শুনে বিদ্যাসাগর বললেন-আমি সিদ্ধ পুরুষ ! কিন্তু আমিতো ভগবানের সাধনা কোনওদিন করিনি। রামকৃষ্ণদেব বললেন—সিদ্ধপুরুষ তোমায় অমনি বলিনি। জানতো আলুপটল সিদ্ধ হলে নরম হয়ে গলে যায়। তুমিও তো অমনি নরম হয়ে গেলে। পরের কষ্ট দেখলে তোমার মন গলে যায়। তোমার এত দয়া তুমি সিদ্ধ নও তো কাকে সিদ্ধপুরুষ বলব ?

রামকৃষ্ণদেব আরও বললেন—তোমার ভেতর সোনা চাপা আছে। এখন জানতে পারছ না যেদিন জানতে পারবে, সেদিন এতযে কাজ সব ত্যাগ হয়ে যাবে।

ঠাকুরকে খাওয়ানোর জন্য বিদ্যাসাগর নিজের হাতে রামকৃষ্ণের সামনে মিষ্টির থালা এগিয়ে দিলেন। খেয়ে তাঁর কি তৃপ্তি কি আনন্দ। ঠাকুর খেতে খেতে গল্প করছেন। বলছেন বিদ্যাসাগর তুমি দরকঁচা পড়া পণ্ডিত নও তো ! শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, তারা নামেই পণ্ডিত, সংসারে তাদের ঘোর আসক্তি। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত তারা। তাদের মন শকুনির মত খোঁজে কেবল ভোগের ভাগাড়। তুমিতো সেরকম নও, তোমার মধ্যে আছে বিদ্যার ঐশ্বর্য-দয়া-ভক্তি-বৈরাগ্য।

দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যাঁর জন্ম সেই মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষণই ব্যয় করেছেন পরের মঙ্গল চিন্তায়। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন অপরের হিতের জন্য। কিন্তু এত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। পারিবারিক জীবনে তিনি তেমন সুখ পাননি, আবার শেষ জীবনে স্ত্রী দীনময়ীদেবীও ইহলোক ত্যাগ করলেন, বিদ্যাসাগরের একাকীত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে। পত্নীশোক পেয়ে তাঁর শরীর আরও ভেঙে পড়ল। বহু চিকিৎসা করান হল কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষে সুদক্ষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ সালজার চিকিৎসা করলেন। প্রথমে একটু ভাল মনে হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুফল ফলল না। জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে জিত হল মৃত্যুর। দেশবাসীকে অনাথ করে তাঁদের চোখের জলে ভাসিয়ে চির বিদায় নিলেন ঊনবিংশ

শতাব্দীর দেশের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ, নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার পথিকৃৎ, আধুনিক চিন্তার জনক, বাংলাগদ্য সাহিত্যের পিতৃপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারিখ ১২৯৮ সালে ১৩ই শ্রাবণ। ইংরাজী ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই। চরম বিষাদের ছায়া নেমে এলো দেশবাসীর বুকে।

সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই দিন সেই সময় ছিলেন তাঁর ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। তিনি তখন বসে আছেন, হঠাৎ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—দেখ দেখ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সোনার রথে চড়ে স্বর্গে চলেছেন।

এক বিরাট বিদ্যাসাগরীয় যুগের অবসান হল। এত বড় মহামানব বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে বড় একটা জন্মাননি। অথচ তাঁর বর্ত্তমান দেশবাসী প্রায় তাঁকে ভুলতে বসেছে। এটাও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যে গৃহে বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ চোদ্দ বছর বাস করেছিলেন ও যে গৃহ তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের স্পর্শে পবিত্র, সেই গৃহটিও সংরক্ষিত হয়নি। এখনও এটি একটি সাধারণ বাসগৃহ রূপে জনৈক মুখোপাধ্যায় পরিবার কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের মানুষ তাদের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বরেণ্য মানুষের গৃহে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রও একত্রিত করে দর্শনীয় ভাবে রাখবার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। একথা লজ্জার হলেও সত্য যে, বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষার কাজে আমরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি।

আমাদের মুখে যিনি ভাষা দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষার ভিত্তি যিনি গড়ে দিয়েছেন, এবং মনুষ্যত্বের পথ যিনি দেখিয়েছেন, সেই মানুষ, জাতির জনক বিদ্যাসাগর। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের দীন শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে, সুগম্ভীর;
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়;
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
সৌম্য-মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার!

—সমাপ্ত—